মাস্টার অংশুমান

সেই সকালটার কথা আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। সেদিন ছিল রবিবার। তিনদিন ধরে সমানে বাদলা করে সেদিনই প্রথম ঝলমলে রোদ বেরিয়েছে। আমি একটা অঙ্ক কষে আমার খাতাটা বন্ধ করেছি এমন সময় বিশুদা এল। বিশুদা, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলি, আমার জ্যাঠতুতো দাদা। সে একটা সিনেমা কোম্পানিতে কাজ করে। বিশুদা এসেই বলল, 'হ্যাঁ রে, তোর পুজোর ছুটি কবে থেকে শুরু হচ্ছে?' আমি বললাম, 'সাতই অক্টোবর। কেন?'

'কারণ তোকে নিয়ে সট্‌কাবার তাল করছি।'

'তার মানে?'

'দাঁড়া, আগে কাকার সঙ্গে কথা বলি।'

বাবা পাশের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন, বিশুদা সটান তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হল, আমি তার পিছনে। বাবা কাগজ থেকে মুখ তুলে বললেন, ' কী রে বিশু—সকাল-সকাল—কী ব্যাপার?'

বিশুদার উত্তর শুনেই আমার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে শুরু করল। 'একটা জরুরি ব্যাপারে তোমার কাছে এসেছি ছোট্‌কা', বলল বিশুদা, 'আমাদের ডিরেক্টর সুশীল মিত্তির একটা ছবি করছেন। বেশিরভাগ শুটিং হবে বাইরে—আজমীরে। এতে একটা বছর বারোর ছেলের পার্ট আছে—খুব ভাল পার্ট, প্রায় বিশদিনের কাজ। আমার বিশ্বাস অংশুকে খুব ভাল মানাবে পার্টটাতে। এখন তুমি যদি...'

'শুধু আমি কেন', বললেন বাবা, 'আমার ছেলের একটা মতামত নেই?'

বাবা যে কথাটা ঠাট্টা করে বলেছেন সেটা জানি, কিন্তু এটা বুঝলাম যে তাঁর খুব একটা আপত্তি নেই। অ্যাক্‌টিং জিনিসটা বাবা খুব পছন্দ করেন সেটা আমি জানি। আমাকে গলা ছেড়ে আবৃত্তি করতে বাবাই শিখিয়েছেন, আর ইস্কুলে আবৃত্তি করে প্রাইজ পেলে বাবাই সবচেয়ে বেশি খুশি হন।'

'ইস্কুল কামাই হবে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন বাবা।

'হলেও বড়জোর দুচারদিন', বলল বিশুদা। 'পুজোর ছুটির মধ্যে চোদ্দ আনা কাজ হয়ে যাবে; তারপর হয়তো চার পাঁচদিনের কাজ থাকবে কলকাতার স্টুডিওতে। অংশু তো ভাল ছেলে—দুচারদিন

কামাইতে ওর কিছু ক্ষতি হবে না।'

'অংশুর কথা যে বলছিস, ও পারবে তো?'

'আলবত', বলল বিশুদা। 'তবে শুধু আমি বললে তো হবে না। কাল সকালে সুশীলবাবুকে একবার নিয়ে আসছি—সুশীল মিত্তির—আমাদের ডিরেক্টর। তবে ওঁর টেস্ট আমি জানি। আই অ্যাম সিওর অংশুকে ওঁর পছন্দ হবে। আর পার্টটাও খুব ভাল। ওই ছেলেকে নিয়েই যত কাণ্ডকারখানা। ওর পার্টটা ও আগেই পেয়ে যাবে, তুমি পড়িয়ে দিও। ওর কোনও অসুবিধা হবে না। তাছাড়া কাজের সঙ্গে সঙ্গে নতুন দেশ দেখা হবে সেটাও কি কম নাকি? কী রে অংশু, আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি নেই তো? বাবা-মা থাকবেন না কিন্তু।'

আমি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম আমার কোনও আপত্তি নেই। আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। বুকের ভিতর ঢিপঢিপ করছে।

বিশুদার দৌলতে আমার স্টুডিওতে গিয়ে শুটিং দেখা হয়ে গেছে। মোটামুটি কী ঘটনা ঘটে সেটা আমি জানি। দেখতে দেখতে আমার অনেকবার মনে হয়েছে—ওরকম আমিও পারি, ক্যামেরার সামনে আমার মোটেই ভয় করবে না। আমার ভুলের জন্য একই শট বার বার নিতে হবে না, কক্ষনও না। অবিশ্যি সেটা কতদূর সত্যি তা এখনও জানি না।

বিশুদা আবার বলল, 'তোর কোনও চিন্তা নেই। কাজটা করতে তোর কোনও অসুবিধা হবে না। আর ছবি শেষ হয়ে সিনেমায় দেখানো হলে তোর কী নাম হয় দেখিস। এমনকী শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতা হিসেবে পুরস্কারটা হয়তো পেয়ে যেতে পারে মাস্টার অংশুমান গাঙ্গুলি।'

পরের দিন ডিরেক্টর সুশীলবাবু এলেন আমাকে দেখতে। ভদ্রলোক গম্ভীর হলেও, কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হল না। উনি বলাতে আমি 'পুরাতন ভৃত্য'টা আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলাম। তাতে মনে হল ভদ্রলোক খুশিই হলেন।

'তবে তোমার একটা ক্যামেরা টেস্ট নিতে হবে দু-চারদিনের মধ্যে', বললেন সুশীলবাবু, 'সে ব্যাপারে বিশু তোমায় জানিয়ে দেবে। কয়েক লাইন কথা তোমার পাঠিয়ে দেব, সেটা তুমি মুখস্থ করে রেখো।'

সুশীলবাবু চলে যাবার পর বাবা বলেন, 'দেখো বাবা, এও একরকম পরীক্ষা কিন্তু। স্কুলের পরীক্ষায় ভাল করো তুমি তেমনই এতেও ভাল করতে হবে। স্কুলে যেমন মাস্টারমশাই তেমনই এখানে ডিরেক্টর হবেন তোমার মাস্টার। তাঁর কথা শুনবে। পড়া যেমন মুখস্থ করো, তেমনই এখানেও তোমার পার্ট ভাল করে মুখস্থ করবে।'

আমার ভয় ছিল যে মা হয়তো বেঁকে বসবেন, কিন্তু তিনিও এককথায় রাজি। ছেলে প্রায় এক মাসের জন্য দূরে চলে যাবে শুনে প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করলেন, কিন্তু বিশুদাকে মা-বাবা দু'জনেই এত ভালবাসেন যে তাঁর উপর আমার ভার দিয়ে দুজনেই নিশ্চিন্ত।

আমি যে পার্টটা পেয়েই গেছি, ক্যামেরা টেস্টটা যে শুধু নাম-কা-ওয়াস্তে, সেটা বুঝলাম যখন দু'দিন পরে বিশুদা আবার এল দরজি নিয়ে আমার জামার মাপ নিতে। কুর্তা আর চাপা পায়জামা পরতে হবে আমাকে, রাজস্থানি পোশাক। কিন্তু শুধু একরকম পোশাকেই হবে না। আমাকে নাকি দুটো পার্ট করতে হবে: এক হল রাজা ভরত সিং-এর ছেলে অমৃৎ সিং, আর আরেক হল গরিব ইস্কুল মাস্টার গোপীনাথের ছেলে মোহন। দু'জনেরই এক বয়স, এক চেহারা। পুষ্করের মেলাতে দু'জনের আলাপ হবে। একসঙ্গে দুজন একরকম দেখতে ছেলেকে দেখাবার জন্য ক্যামেরার কারসাজি ব্যবহার করা হবে। দুই নতুন বন্ধুতে মেলা ছেড়ে যাবে একটা নিরিবিলি জায়গায় খেলা করতে। সেখানে দুজন পোশাক অদলবদল করবে মজা করার জন্য। আর তার ফলে তিনজন গুণ্ডা রাজপুত্র ভেবে মোহনকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে। তাদের মতলব হল রাজার কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করে তারপর ছেলেকে ফেরত দেওয়া। এদিকে অমৃৎ বাড়ি ফিরে আসে মোহনের পোশাক পরে, আর এসে বাবা-মাকে সব কথা বলে। ছেলে পার পেয়ে গেছে জেনে বাবা-মা হাঁফ ছাড়েন, কিন্তু অমৃৎ জোর গলায় বলে যে তার বন্ধুকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত সে কারুর সঙ্গে কথা বলবে না। শেষকালে গল্পের হিরো তরুণ পুলিশ ইনস্পেক্টর সূর্যকান্ত রাঠোর অসমসাহসের পরিচয় দিয়ে মোটর সাইকেলে করে দস্যুদের হাত থেকে মোহনকে

উদ্ধার করে আনবে।

গল্পটা জেনে আর পার্ট দুটো পড়ে আমার উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল, আর সেইসঙ্গে মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন জমা হতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে দুর্দান্ত সাহসী সূর্যকান্তর পার্টে কে অ্যাক্‌টিং করবে সেটা জানার জন্য ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল। বিশুদা বলল ওই পার্টে শঙ্কর মল্লিক বলে একজন নতুন ছেলেকে নেওয়া হচ্ছে, সে নাকি দারুণ স্মার্ট আর খুব ভাল দেখতে। আমি বললাম, 'কিন্তু ও কি মোটর সাইকেল চালাতে জানে?'

বিশুদা হেসে বলল, 'তা জানে ঠিকই, কিন্তু স্টান্টবাজির জন্য তো মাইনে-করা স্টান্টম্যান আসছে বম্বে থেকে।'

'স্টান্টম্যান? সে আবার কী?'

'সে পরে দেখতে পাবি', বলল বিশুদা।

পাঁচই অক্টোবর আমাদের শুটিং-এর দল রওনা দিল আজমীর। হাওড়া থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে বান্দিকুই, বান্দিকুই থেকে আজমীর। তার মানে দুবার চেঞ্জ। পাঁচই সন্ধ্যায় রওনা হয়ে সাতই রাত্রে পৌঁছানো। আগে থেকে বগি বুক করে রাখা ছিল। চাকরবাকর ছাড়া আর সকলেই ধরে গেছে একটা ফার্স্ট ক্লাস বগিতে। ট্রেনেই আমার সকলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। অ্যাকটরদের মধ্যে এখন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন সাতজন। এদের কাজ একেবারে প্রথম দিকেই। বাকি সবাই ক্রমে ক্রমে এসে পড়বেন। অমৃৎ সিং-এর বাবা-মা, মানে রাজা-রানীর পার্ট করছেন পুলকেশ ব্যানার্জি আর মমতা সেন। ইনস্পেক্টর সূর্যকান্তের পার্ট করছেন শঙ্কর মল্লিক, সে তো আগেই বলেছি। এ ছাড়া আছেন গুণ্ডাদের সর্দার ছগনলালের পার্টে জগন্নাথ দে। ইনি বাংলা ছবির নামকরা দুষ্টু লোক, বা যাকে বলে ভিলেন। এঁকে সবাই জগু ওস্তাদ বলে ডাকে। এইসব অ্যাকটর ছাড়া আছেন ডিরেক্টর সুশীলবাবু, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট উজ্জ্বল প্রামাণিক, ক্যামেরাম্যান ধীরেশ বোস, গল্পের লেখক সুকান্ত গুপ্ত, মেক-আপম্যান সজল সরকার। অ্যাসিস্ট্যান্টদের দলে আছেন সবসুদ্ধ আটজন, আর সবশেষে বিশুদা। এঁদের মধ্যে চোদ্দজন ট্রেন ছাড়বার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো কামরায় ভাগ করে তাস খেলতে শুরু করেছেন। সাতজন খেলছেন রামি, আর সাতজন ফ্লাশ। আমি রামি জানি, তাই সেই কামরাতেই বেশিটা সময় কাটাচ্ছি। বিশুদাও রামির দলে ভিড়ে পড়েছে। যাঁরা খেলছেন না তাঁদের মধ্যে আছেন ডিরেক্টর সুশীলবাবু আর গল্প লিখিয়ে সুকান্ত গুপ্ত। এঁরা দুজন ছবি নিয়ে আলোচনা করছেন। এছাড়া পুলকেশ ব্যানার্জি আর মমতা সেন দু'জনেই হাতে ম্যাগাজিন নিয়ে বসে আছেন।

আমাকে আমার পার্ট দিয়ে দিয়েছে বিশুদা কলকাতায় থাকতেই। একটা ফাইলের মধ্যে প্রায় বিশপাতা ফুলস্ক্যাপ কাগজ। সেটা বাবা একবার পড়িয়ে শুনিয়ে দিয়েছেন আমাকে। তা থেকে আমি খানিকটা বুঝে গেছি কীভাবে আমাকে অ্যাক্‌টিং করতে হবে। খুব বেশি কথা নেই, তাই মুখস্থ করতে অসুবিধা হবে না। আসবার দুদিন আগে কলকাতার স্টুডিওতে আমার টেস্টটা নেওয়া হয়ে গেছে; তাতে শঙ্কর মল্লিকের সঙ্গে একটা ছোট দৃশ্যে আমাকে রাজস্থানি পোশাক পরে অ্যাক্‌টিং করতে হয়েছে ক্যামেরার সামনে। কাজটা নিশ্চয়ই ভাল হয়েছিল, তা না হলে সুশীলবাবু কেন আমার পিঠ চাপড়ে দু'বার 'একসেলেন্ট' বলবেন? আর সেই থেকেই লক্ষ করছি আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সুশীলবাবু হাসছেন।

বর্ধমানে থালিতে ডিনার খাবার পর আমি একটা আপার বার্থে উঠে নিজেই হোল্ডঅল খুলে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। মমতা সেন আমার কামরায় ছিলেন। তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে এবার থেকে মমতামাসি বলে ডাকবে, কেমন? আর কোনও কিছু দরকার-টরকার হলে আমাকে বলবে।'

আমি পাশ ফিরে চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম। না জানি কত কী ঘটনা ঘটবে সামনের একমাসে। বিশুদা আছে, তাই বাবা-মা যে নেই সে-কথা মনেই হচ্ছে না। একবার কালিম্পং গিয়েছিলাম আমার মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে। সেবারও বাবা-মা ছিলেন না। আমার কিন্তু কোনও অসুবিধাই হয়নি। আমি জানি এবারও হবে না। কাজের মধ্যে দেখতে দেখতে একমাস পেরিয়ে যাবে।

এই ভাবতে ভাবতেই কখন যে ঘুম এসে গেছে, টেরই পাইনি।

॥ ২ ॥

বাবা কলেজে ইতিহাস পড়ান, তিনিই আমাকে বলেছিলেন যে, আজমীর শহরটা ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর দখল করে নেন মারওয়াড় অধিপতি মালদেও-এর হাত থেকে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আজমীর ব্রিটিশদের হাতে চলে আসে। আজমীর থেকে এগারো কিলোমিটার পশ্চিমে হল পুষ্কর। এটা হল হিন্দুদের একটা বড় তীর্থস্থান। এখানে একটা হ্রদ আছে যেটাকে ঘিরে প্রতি বছর কার্তিক মাসে একটা মেলা বসে, যাতে লাখের উপর লোক আসে। আমাদের ফিল্মের গল্পে অবিশ্যি আজমীর হয়ে যাচ্ছে কাল্পনিক শহর হিণ্ডোলগড়। আমাদের ফিল্মের নামও হিণ্ডোলগড়। পুষ্কর অবিশ্যি পুষ্করই থাকছে, আর এই পুষ্করের মেলাতেই ইস্কুল মাস্টারের ছেলে মোহনের সঙ্গে রাজকুমার অমৃৎ সিং-এর আলাপ হচ্ছে।

রাত করে আজমীর পৌঁছে আমরা সোজা চলে গেলাম সার্কিট হাউসে। এইখানেই তিন সপ্তাহের জন্য আমরা থাকব। বেশ বড় সার্কিট হাউস, দোতলায় উত্তর আর পশ্চিমে চওড়া বারান্দা, সেখানে দাঁড়ালেই উত্তরে প্রকাণ্ড আনা সাগর লেক, আর পশ্চিমে পাহাড় দেখা যায়। রাত্তিরে অবিশ্যি দেখার কিছুই নেই, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম যে আমরা একটা অদ্ভুত জায়গায় অদ্ভুত বাড়িতে এসে পড়েছি। আকাশে তিনভাগের একভাগ চাঁদের ফিকে আলো পাতলা কুয়াশায় ঢাকা লেকের জলে পড়ে দারুণ দেখাচ্ছে। দূরে শহরে কোথায় যেন ঢোলক বাজিয়ে গান হচ্ছে, এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

আমি বারান্দার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম, বিশুদা এসে বলল, 'চ' তোর ঘর ঠিক হয়ে গেছে, মমতাদি শোবেন একই ঘরে; তোর কোনও ভয় নেই।'

ভয় আমার এমনিতেই ছিল না। এত লোকের সঙ্গে একসঙ্গে থাকব, তাতে আবার ভয় কীসের? 'আমার কাজ কবে থেকে শুরু?' আমি জিজ্ঞেস করলাম বিশুদাকে।

ও বলল, 'কাল একবার পুষ্কর দেখতে যাওয়া হবে, আর যে বাড়িটা রাজবাড়ি হবে সেই বাড়িটা। কাজ শুরু পরশু থেকে।'

কথার মাঝখানে মমতামাসি এসে বললেন, 'কী অংশু, মা'র জন্য মন কেমন করছে?'

সত্যি বলতে কি, বাড়ির কথা একবারও মনে হয়নি, আর সেটাই বললাম মমতামাসিকে।

'এই তো চাই', বললেন মমতামাসি। 'আমি যদ্দিন আছি তদ্দিন আমিই কিন্তু তোমার মা, বুঝেছ? কোনও অসুবিধা হলে আমাকে বলবে।'

রাত্তিরে ঘুমটা ভালই হল।

সকালে উঠে বারান্দায় বেরোতেই প্রথম সত্যি করে লেকটা দেখতে পেলাম। বিরাট লেক, ওপারের সবকিছু ছোট ছোট দেখাচ্ছে। জলে অসংখ্য হাঁস চরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়টা বেশ উঁচু, একেবারে লেকের জল থেকে উঠেছে বলে মনে হয়।

ডিম রুটি আর চমৎকার বড় বড় জিলিপি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে ন'টার সময় প্রথম দেখতে গেলাম হিরে জহরতের ব্যবসায়ী ধনী স্বরূপলাল লোহিয়ার বাড়ি। দলের বেশিরভাগ লোকই সার্কিট হাউসে রয়ে গেছে, বেরিয়েছি শুধু ছ'জন—আমি, বিশুদা, সুশীলবাবু, সুশীলবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট মুকুল চৌধুরী, ক্যামেরাম্যান ধীরেশ বোস আর গল্পের লেখক সুকান্ত গুপ্ত। একটা বড় বাস আর তিনটে ট্যাক্সি ভাড়া করা হয়েছে তিন সপ্তাহের জন্য, তার মধ্যে দুটো ট্যাক্সি আজ খাটছে। মিঃ লোহিয়ার বাড়িটাকে বাড়ি বললে ভুল হবে; বরং দুর্গ বলা উচিত। চারদিকে পরিখা নেই বটে, কিন্তু গাছপালা পুকুর মন্দির সমেত জমি রয়েছে বিশাল। এই কেল্লাই হবে রাজবাড়ি, আর এই বাড়ির ছেলেই হবে অমৃৎ সিং।

সত্যি বলতে কি, এরকম বাড়ি আমি কখনও দেখিনি। হলদে পাথরের তৈরি। কতকালের যে পুরনো তা দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। মোঘল আমলের হলেও অবাক হব না। শেষ পর্যন্ত সেটাই ঠিক বলে জানা গেল।

মিঃ লোহিয়ার বয়স ষাটের উপর। ধবধবে সাদা চুল আর চাড়া দেওয়া বিরাট সাদা গোঁফ। আমাদের সবাইকে খুব খাতির করে বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন তিনি ফিল্ম বেশি দেখেন না। তবে বাংলা আর বাঙালিদের খুব ভালবাসেন। তাঁর এক মামাতো ভাইয়ের পরিবার নাকি দু'শ বছর

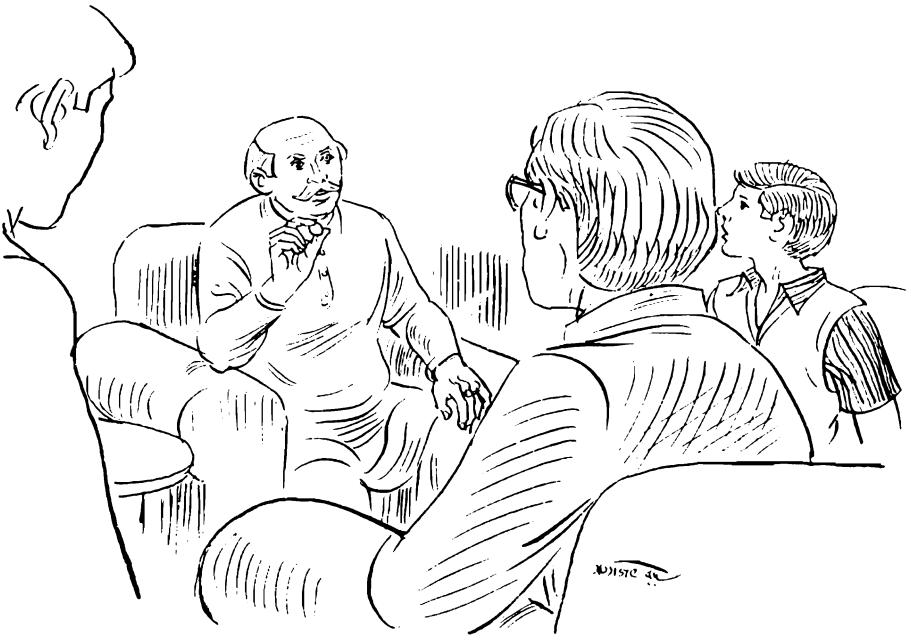

ধরে কলকাতায় থেকে ব্যবসা করছে। এই মামাতো ভাই মতিলাল চুনৌরিয়ার সঙ্গে আমাদের ছবির প্রোডিউসারের আলাপ ছিল। তিনিই মিঃ লোহিয়াকে চিঠি লিখে আমাদের শুটিং-এর বন্দোবস্তটা করে দিয়েছেন। একটা সুবিধা হচ্ছে যে, এ বাড়ির লোকের তুলনায় ঘরের সংখ্যাটা অনেক বেশি। তার মধ্যে কয়েকটা ঘরে শুটিং হলে বাড়ির লোকের কোনও অসুবিধা হবার কথা নয়।

মিঃ লোহিয়া আমাদের চা আর লাড্ডু খাওয়ালেন, আর তারপর তাঁর কিছু হিরে জহরত বার করে দেখালেন। দেখে আরেকবার চোখটা টেরিয়ে গেল। সবশেষে একটা নীল পাথর দেখালেন তার সাইজ একটা পায়রার ডিমের মতো, সেটার নাম নীলকান্তমণি। এরকম পাথর নাকি খুব কমই পাওয়া যায়। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল সেটার দাম জিজ্ঞেস করার; শেষ পর্যন্ত সুশীলবাবুই সেটা করলেন। তাতে মিঃ লোহিয়া একটু হেসে বললেন, 'ইট ইজ প্রাইসলেস।' তার মানে এর দামের কোনও হিসেব হয় না। মনে মনে ভাবলাম, বাড়ির গেটে কি সাধে বন্দুকধারী দরোয়ান রেখেছেন লোহিয়া সাহেব? এই এক বাড়িতে কোটি কোটি টাকার ধনরত্ন রয়েছে।

মিঃ লোহিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গেলাম পুষ্কর। পথে একটা গিরিবর্ত্ম পড়ে যেটা প্রায় এক মাইল লম্বা। দু'দিকে খাড়া পাহাড়, আর তার মধ্যে দিয়ে রাস্তা। পুষ্কর পৌঁছতে লাগল কুড়ি মিনিট।

সুকান্তবাবুর খুব পড়ার বাতিক; তিনিই রাজস্থান সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়ে এসেছেন; তিনিই বললেন যে দেড় হাজার বছর আগেও নাকি পুষ্কর ছিল ভারতবর্ষের একটা প্রধান তীর্থস্থান। হ্রদের পাশের মন্দিরগুলো আওরঙ্গজেব ভেঙে ফেললেন, তার জায়গায় নতুন মন্দির তৈরি করেছে। তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে বিখ্যাত সেটা হল ব্রহ্মার মন্দির। ভারতবর্ষে এটাই নাকি একমাত্র মন্দির যেখানে ব্রহ্মাকে পুজো করা হয়। মন্দিরের বাইরে উপর দিকে ব্রহ্মার বাহন হাঁসের মূর্তি রয়েছে। আমাদের মধ্যে দুজন—সুশীলবাবু আর লেখক সুকান্তবাবু—মন্দিরে ঢুকে পুজো দিয়ে এলেন।

দু'দিন পরেই পুষ্করের মেলা আরম্ভ। লেকের দক্ষিণে প্রকাণ্ড খোলা মাঠে মেলার তোড়জোড় চলছে। উট, গোরু আর ঘোড়া আসতে শুরু করেছে। এই তিনটি জিনিসের এতবড় হাট নাকি আর

কোথাও বসে না। যেদিকে মেলা বসবে, তার উলটো দিকে খানিকটা অংশে গাছপালা আর একটা পুরনো ভাঙা হাভেলির জায়গাটা সুশীলবাবু আর ক্যামেরাম্যান ধীরেশ বোস বেছে নিলেন অমৃৎ আর মোহনের পোশাক বদল আর কিডন্যাপিং-এর দৃশ্যের জন্য। এইখানেই তিনজন দস্যু এসে অমৃৎবেশী মোহনকে কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে পালাবে। অবিশ্যি এই দস্যুরা পুরনো আমলের দস্যু নয়। এরা মোহনকে নিয়ে পালাবে একটা মোটর গাড়িতে, উট বা ঘোড়ায় চড়ে নয়।

পুষ্কর থেকে ফিরতে ফিরতে হয়ে গেল সাড়ে বারোটা। দুপুরে খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল সার্কিট হাউসের একতলার ডাইনিং রুমে। একসঙ্গে পনেরোজন খেতে বসেছে, হিরো ভিলেন সবাই আছে। বেশ একটা গমগমে পিকনিক-পিকনিক ভাব। এই ভাবটা চলবে যত দিন আজমীরে আছি ততদিন। অবিশ্যি কাজ শুরু হলে ক্রমে ক্রমে সার্কিট হাউসের সঙ্গে সম্পর্কটা কমে আসবে, কারণ সারাদিনই প্রায় বাইরে বাইরে থাকতে হবে।

খেতে খেতে সুশীলবাবু তুললেন মিঃ লোহিয়ার হিরে জহরতের কথা। আমরা নীলকান্তমণির মতো একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে এসেছি বলে যারা যায়নি তারা সকলেই আফসোস করল।

দুপুরে খাবার পর আগামীকাল যে দৃশ্যটা শুটিং হবে সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। এটা জানি যে ছবির শুটিং ঠিক পর পর গল্পের ঘটনা ধরে হয় না। অনেক সময় পরের দিকের দৃশ্য আগে আর গোড়ার দিকের দৃশ্য শেষে তোলা হয়। যেমন, কালকে যে দৃশ্যটা প্রথম তোলা হবে সেটা হল মেলা থেকে ফেরার পরের দৃশ্য। যদিও প্রথম দিনের কাজ, কিন্তু খুব সহজ নয়। আমি ফাইলটা খুলে কালকের পার্টটা একবার দেখে নিচ্ছি, এমন সময় বিশুদা এসে বলে গেল যে সন্ধেবেলা বারান্দায় রিহার্সাল হবে; আমি রাজা, রানি, রাজার দেওয়ান—সকলকেই থাকতে হবে। মনে মনে বললাম, এই শুরু হল কাজ।

এই কাজ করতে কত কী কাণ্ড হবে সেটা কি আগে থেকে জানতাম?

॥ ৩ ॥

পরদিন ভোর ছ'টায় উঠতে হল। শুধু আমাকে নয়, যাদের শুটিং-এ দরকার হবে তাদের সকলকেই ভোর ছ'টায় চা এনে দিয়ে উঠিয়ে দিল পঞ্চানন বেয়ারা। ব্রেকফাস্ট পরে হবে—এটা ছিল যাকে বলে বেড-টি। আমার এ জিনিসে অভ্যাস নেই, কিন্তু এখানে আর সকলের সঙ্গে চা খেতে মোটেই খারাপ লাগল না। আজমীরে অক্টোবর মাসে সকালে একটা শীত-শীত ভাব থাকে, তাই মমতামাসি আমাকে জোর করে একটা পুলোভার পরিয়ে দিলেন। রোদ বাড়লে সেটা খুলে ফেললেই হবে।

গতকাল রিহার্সাল ভালই হয়েছে। আমার যেটুকু ভয়-ভয় ভাব ছিল সেটা অন্যদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে একদম কেটে গেছে। রাজবাড়িতে কিছু ছোট পার্ট করার জন্য আজমীর থেকেই তিনজন বাঙালিকে নেওয়া হয়েছে; তারা এখানের বহুদিনের বাসিন্দা। বিশুদাই খোঁজ করে তাদের জোগাড় করে এনেছে। বিশুদাকে সারাক্ষণ চরকিবাজির মতো ঘুরতে হয়। ওর কাজটাকে বলে প্রোডাকশন ম্যানেজারের কাজ। এই একজন লোক যার এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই।

আজ সকালে ন'টা থেকে কাজ আরম্ভ হবার কথা। একটার সময় লাঞ্চের জন্য একঘণ্টা ছুটি, তারপর আবার দুটো থেকে কাজ। আমার কাজটা বিকেলের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। সন্ধ্যার পরেও কাজ আছে, তাতে তিন গুণ্ডাকে দরকার হবে আর আমাকে লাগবে মাত্র একটা শটের জন্য। ছগনলাল গুণ্ডা তার দুই শাকরেদকে নিয়ে রাজবাড়ির পাঁচিলের বাইরে হানা দিতে এসেছে। তারা মতলব করছে রাজকুমার অমৃৎকে নিয়ে পালাবে, তারই সুযোগ খুঁজছে। রাজবাড়ির বাইরে থেকে দোতলার একটা ঘরে তারা অমৃৎকে দেখতে পায়। অমৃৎ এ-ঘর সে-ঘর খেলা করে বেড়াচ্ছে, আর ছগনলাল তাকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছে। এই হল দৃশ্য।

আজ আমাদের সব গাড়িগুলোকেই দরকার হল। বাসের মাথায় প্রথমে চাপানো হল ক্যামেরা চলার জন্য রেলগাড়ির মতো লাইন। টুকরো-টুকরো আট দশ ফুটের লাইন পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে বড় লাইন হয়ে যায়। তার উপর দিয়ে চলে চাকাওয়ালা গাড়ি, যাকে বলে ট্রলি, আর সেই ট্রলির উপর বসে

ক্যামেরা। এই ট্রলিও উঠেছে বাসের মাথায়। আর উঠেছে স্টুডিওর বড় বড় আলো। দিনের বেলাও ঘরের ভিতর কাজ করতে বাইরে থেকে আসা আলোর সঙ্গে বাড়তি ইলেকট্রিক আলো যোগ করতে হয়।

আজ সকালে আমি ছাড়া অ্যাক্‌টিং-এর জন্য দরকার হবে রাজা, রানি, দেওয়ান আর আরও জনা তিনেক লোক, যাদের কোনও কথা বলতে হবে না। এদের বলা হয় একস্ট্রা, আর এদের সবাইকে আজমীরেই পাওয়া গেছে। এখানে একটা হিন্দি নাটকের দল আছে, তারা গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিল সার্কিট হাউসে। তারা বলে গেছে লোক দিয়ে সাহায্য করবে।

সাড়ে সাতটার সময় আমাদের গাড়ি আর বাস রওনা দিয়ে দিল। মিঃ লোহিয়ার বাড়ি যেতে দশ মিনিট লাগে, কাজেই সময় আছে অনেক। কিন্তু তোড়জোড়ে যে অনেক সময় বেরিয়ে যায় সেটা আমি একদিন স্টুডিওতে টেস্ট দিয়েই বুঝেছি। যিনি রাজা সাজবেন, সেই পুলকেশ ব্যানার্জি প্রায় পনেরো বছর হল ফিল্মে অ্যাকটিং করছেন। সেইসঙ্গে থিয়েটারও করেন। তিনি গাড়িতে আমার পাশেই বসেছিলেন, যাবার পথে বললেন, 'এসো মাস্টার অংশুমান, আমাদের পার্টগুলো একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক।' আমারও আপত্তি নেই, তাই গাড়ি চলতে চলতেই কয়েকটা রিহার্সাল দিয়ে দিলাম।

রাজবাড়িতে পৌঁছে আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেওয়া হল। মিঃ লোহিয়া পুরো একতলাটা ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের জন্য। তা ছাড়া শুটিং-এর জন্য দোতলার তিনটে ঘর ছাড়া আছে। সেসব ঘরে চেয়ার টেবিল কার্পেট ছবি ঝাড়-লণ্ঠন সবই রয়েছে, আর সেগুলোই ছবিতে ব্যবহার করা হবে। ঘরে রাখার জন্য কলকাতা থেকে প্রায় কিছুই আনতে হয়নি।

যতক্ষণ একতলায় খাওয়া হচ্ছে, ততক্ষণে কাজের জিনিসপত্র দোতলায় যে ঘরে শুটিং হবে সেখানে চলে গেল। পুলকেশবাবু আর মমতামাসি খাওয়া শেষ করেই একতলার বারান্দায় মেক-আপ করার জন্য বসে গেলেন। আমাকে রঙ মাখতে হবে না, শুধু চুলটাকে একটু অন্যরকমভাবে আঁচড়ে নিতে হবে। খানিকটা সময় আছে, তাই ভাবছি কী করব, এমন সময় একটা আওয়াজ শুনে আমার চোখ চলে গেল বাড়ির সামনের মাঠের দিকে। একটা মোটরসাইকেল মাঠের উপর ফটফটিয়ে বেড়াচ্ছে, আর তাতে চড়ে আছে বিশুদা।

দু'পাক ঘুরেই বিশুদা সাইকেলটাকে আমার সামনেই এনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'আয়, পেছনে বোস। দু' চক্কর ঘুরিয়ে আনি তোকে।'

আমি জানি যে গল্পে ইনস্পেক্টর সূর্যকান্তর সঙ্গে আমাকে মোটরবাইকের পিছনে চড়তে হবে, তাই ক্যারিয়ারে উঠে বসলাম, আর বিশুদা প্রচণ্ড শব্দ করে বাইক ছেড়ে দিল। আমার হাত দুটো বিশুদার কোমরে জড়ানো, কানের পাশ দিয়ে শনশন্ করে হাওয়া যাচ্ছে, এ এক দারুণ মজা। বিশুদা যে এত ভাল মোটরবাইক চালায় সেটা জানতামই না। সে মোটরগাড়ি চালায় অবিশ্যি অনেকদিন থেকেই।

তিন পাক ঘুরে বাইকটাকে আবার বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করাল বিশুদা। এও একটা রিহার্সাল বইকী! আমার মন বলছে স্টান্টম্যান যদি তেমন ওস্তাদ হয়, তা হলে তার পিছনে চড়তে আমার কোনও ভয় লাগবে না। গল্পে এক জায়গায় আছে ইনস্পেক্টর সূর্যকান্ত মোহনকে ডাকাতদের হাত থেকে উদ্ধার করে মোটরসাইকেলে ছুটে চলেছে, আর ডাকাতরা তাদের তাড়া করেছে অ্যাম্বাসাডরে। তাদের এড়াবার জন্য সূর্যকান্ত রাস্তা ছেড়ে এবড়ো-খেবড়ো মাঠে নেমে পড়েছে। মোহন আঁকড়ে ধরে আছে সূর্যকান্তর কোমর আর বাইক বেদম স্পিডে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেছে মাঠের উপর দিয়ে। আর তারপর? এটাই আসল, এখানেই হাততালি পড়বে সিনেমা হলে—মাঠ থেকে বাইক কাঁচা রাস্তায় নেমেছে, ডাকাতদের গাড়ি আবার তাদের পিছু নিয়েছে, এবার রাস্তা হঠাৎ চড়াই ওঠে। ওঠবার আগে মোটরসাইকেলের স্পিড ভীষণ বাড়িয়ে দেয় সূর্যকান্ত। তার কারণ আর কিছুই না—সামনে একটা দশ হাত চওড়া নালা, তাতে জল বইছে তোড়ে, সেই নালা এক লাফে পেরিয়ে উলটো দিকের উতরাইতে পড়তে হবে। গল্পে অবিশ্যি আছে সূর্যকান্ত স্বচ্ছন্দে নালা টপকে পেরিয়ে গেল, কিন্তু শুটিং-এ বম্বের স্টান্টম্যান সেটা পারবে কি? আর সেটা করার সময় কি আমাকেই থাকতে হবে মোটর সাইকেলের ক্যারিয়ারে স্টান্টম্যানের কোমর জড়িয়ে ধরে?

এ বিষয় এখন কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল। যা হবার সে তো পরে জানতেই পারব। কাজটা ভাল

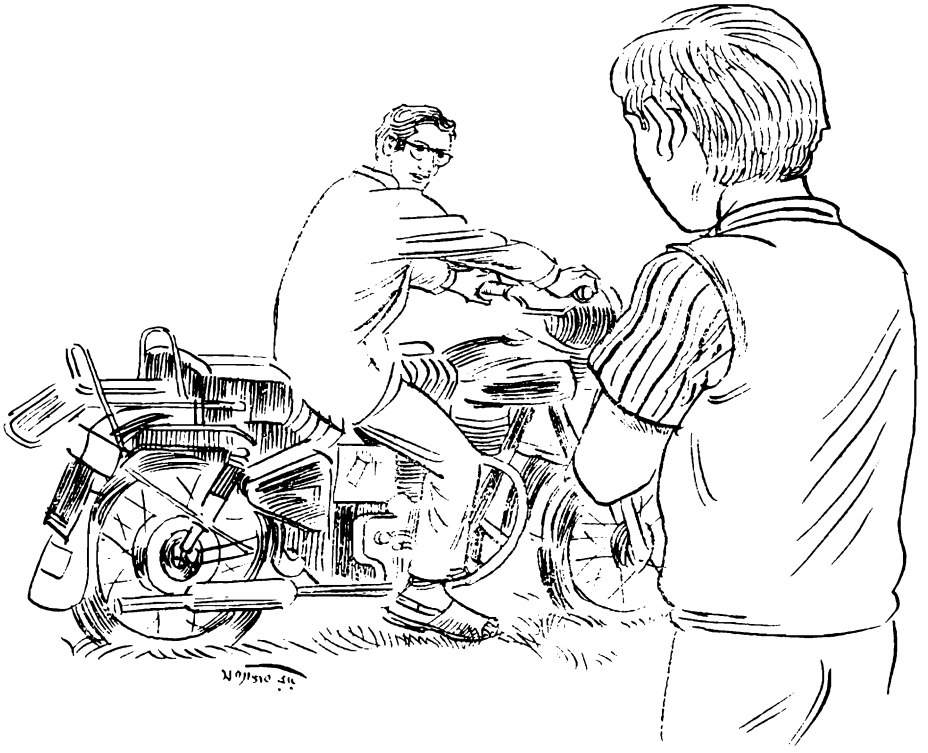

হবার জন্য যদি আমাকেই থাকতে হয় তা হলে তাই করব।

সাইকেল থেকে নেমে বিশুদা বলল, 'সূর্যকান্তর জন্য এই বাইকটা ভাড়া করা হল। আশা করি ক্যাপ্টেনের পছন্দ হবে।'

'ক্যাপ্টেন?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ক্যাপ্টেন আবার কে?'

'ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ', বলল বিশুদা, 'স্টান্টম্যান। আজ রাত্তিরে আসছে বম্বে থেকে।'

কৃষ্ণণ! বম্বে থেকে এলেও লোকটা যে মাদ্রাজি সেটা নাম শুনেই বুঝতে পারলাম।

॥ ৪ ॥

প্রথম দিনের কাজটা খুব ভাল ভাবেই উতরে গেল। প্রথম শটই ছিল আমার—মোহনের পোশাকে এসে ঘরে ঢুকছি দেওয়ানের সঙ্গে। সামনে বাবা, পোশাক বদল দেখে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা। প্রথমবারেই ঠিক হওয়ার জন এক চোট সকলের হাততালি পেলাম। এমনকী মিঃ লোহিয়া শুটিং দেখছিলেন তাঁর নাতিকে সঙ্গে নিয়ে, তিনিও হাততালিতে যোগ দিলেন। আজ বাবা-মার কথা মনে হয়ে মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমন সুন্দর শুটিং তাঁরা দেখলে না জানি কত খুশি হতেন! কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার দ্বিতীয় শটের জন্য তৈরি হতে হবে বলে দুঃখটা ঝেড়ে ফেলে দিতে হল। বিশুদা প্রথম শট-এর সময় ছিল। সে শট-এর পর আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে ফিসফিস করে বলে গেল, 'এইভাবে চালিয়ে যা। কুছ পরোয়া নেহি!'

রাজার পার্টে পুলকেশ ব্যানার্জিও বেশ ভালই করলেন, কিন্তু তিনি একটা কথা বললেন লাঞ্চের সময়, সেটা আমার খুব মজার লাগল।—'জানো মাস্টার অংশুমান, শিশু অভিনেতা পাশে থাকলে আর

বড়দের দিকে কেউ চায় না। আমরা মিথ্যেই খেটে মরছি।' এটাও লক্ষ করলাম যে প্রত্যেক শট-এর আগে পুলকেশবাবু চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন বলে নেন। বোধহয় ঠাকুরের নাম করে নেন।

মমতামাসির অ্যাক্টিং-ও আমার খুব ভাল লাগল। বিশেষ করে চোখে জল আনার ব্যাপারটা। অনেক অ্যাক্টর নিজে থেকে চোখে জল আনতে পারে না। কান্নার দরকার হলে তারা শটের আগে চোখের কোনায় গ্লিসারিনের ফোঁটা দিয়ে নেয়। তার ফলে চোখ জ্বালা করে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ জলে ভরে যায়। মমতামাসি বললেন তাঁর গ্লিসারিনের দরকার হবে না। অবাক হয়ে দেখলাম যে, সত্যিই তাই। দস্যুরা তাঁর ছেলেকে না নিয়ে ভুল করে অন্য ছেলেকে নিয়ে গেছে জেনে তাঁর এত আনন্দ হয়েছে যে, কান্নায় ভেঙে পড়ে নিজের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বিকেল পাঁচটার মধ্যে পুরো দৃশ্যটা শেষ হয়ে গেল। এর পরের কাজটা অন্ধকার হলে পর হবে; তার মানে সাতটার আগে নয়। পুলকেশবাবু আর মমতামাসি সার্কিট হাউসে ফিরে গেলেন। বাকি কাজটা খুবই সোজা; আমাকে শুধু এ ঘর ওঘর ঘুরতে হবে, আর ক্যামেরা সেটা পাঁচিলের বাইরে থেকে এমনভাবে তুলবে যে, মনে হয় যেন দস্যুরাই ব্যাপারটা দেখছে।

দুটো ঘণ্টা দিব্যি বেরিয়ে গেল গ্রামোফোন শুনে। মিঃ লোহিয়ার একটা চোঙাওয়ালা পুরনো গ্রামোফোন আছে, আর আছে রাজ্যির পুরনো হিন্দি ওস্তাদি গানের রেকর্ড। সেই সব রেকর্ড তিনি বাজিয়ে শোনাচ্ছিলেন। দম দেওয়া গ্রামোফোন এর আগে আমি কখনও দেখিনি। অ্যাসিস্ট্যান্ট মুকুল চৌধুরী খুব ওস্তাদি গানের ভক্ত; সে বলল, এসব রেকর্ড নাকি আজকাল একেবারেই পাওয়া যায় না। অথচ মিঃ লোহিয়া সেগুলোকে এমন যত্নে রেখেছেন যে, এতদিনেও পুরনো হয়নি।

সাতটার কিছু আগেই গান শোনা বন্ধ করে শটের জন্য তৈরি হতে শুরু করলাম। এবার রাজপুত্রের পোশাক, ঠিক পনেরো মিনিট লাগল তৈরি হতে। কিন্তু তা হলে কী হবে, খবর এল যে কাজে একটু দেরি হবে; আসল দস্যু ছগনলাল যে সাজবে সেই জগন্নাথ দে বা জগু ওস্তাদকে পাওয়া যাচ্ছে না। বিশুদা হন্তদন্ত হয়ে সকলকে জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছে কেউ জগন্নাথকে দেখেছে কিনা। বিকেলে আমি নিজে দেখেছি ভদ্রলোককে; এর মধ্যে হঠাৎ তিনি গেলেন কোথায়?

এখানে বলে রাখি যে, অ্যাকটর হিসেবে তিনি যতই ভাল হন, লোক হিসেবে আমার জগু ওস্তাদকে তেমন ভাল লাগছে না। তার দুটো কারণ আছে। এক হল, জগু ওস্তাদের হাসিটা পরিষ্কার নয়। সত্যি বলতে কি, পান-দোক্তা খাওয়া অমন দাঁতে পরিষ্কার হতেও পারে না। দ্বিতীয় কারণ হল, দলের দুই চাকর ভিখু আর পঞ্চাননের সঙ্গে ভদ্রলোকের ব্যবহার মোটেই ভাল না। এটা আমার ভীষণ খারাপ লাগে, বিশেষ করে এই কারণে যে, ওরা দুজনেই দারুণ পরিশ্রম করতে পারে।

বিশুদা জগু ওস্তাদকে খুঁজতে যাবার আগে সুশীলবাবুর সঙ্গে কথা বলে গেল যে, ইতিমধ্যে যেন আমার শটটা নেওয়া হয়ে থাকে। আমি তো তৈরি, এখন শুধু বাকি আলো বসানো। সাধারণ বিজলিবাতিতে শুটিং সম্ভব নয়, তাই স্টুডিওর বড় আলো ব্যবহার করতে হবে। ডিরেক্টর সুশীলবাবু এসে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন কেমন করে এ-ঘর থেকে ও-ঘর চলাফেরা করতে হবে। 'মনে মনে গুনগুন করে গান গাও', বললেন সুশীলবাবু, 'আর সেই গানের তালে তালে পা ফেলো। তা হলে চলাটা স্বাভাবিক আর মজাদার হবে। আসলে রাজপুত্রের কিছু করার নেই তাই সে আপনমনে এ-ঘর ও-ঘর করছে। এই ভাবটা ছবিতে ফুটে ওঠা চাই।'

আমি একটু একটু গাইতে পারি, কিন্তু কী গান গাইব সেটা চট করে ভেবে পেলাম না। সুশীলবাবুকে জিজ্ঞেস করাতে উনি একটু ভেবে বললেন, 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় জানো?'

আমি হ্যাঁ বলতে সুশীলবাবু বললেন, 'ভেরি গুড, তা হলে ওটাই গুনগুন কোরো।' আমি মনে মনে গানটা একবার গেয়ে নিলাম। পুরো গানের কথা মনে নেই, আর তার দরকারও নেই।

আধঘণ্টার মধ্যে শটটা খুব সুন্দরভাবেই হয়ে গেল। তারও আধঘণ্টা পরে বিশুদা এসে খবর দিল যে, জগু ওস্তাদকে পাওয়া গেছে। বিশুদা একেবারে ফায়ার হয়ে আছে দেখে আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, কিন্তু কথাবার্তাতে বুঝলাম যে জগু ওস্তাদের নেশা করার বাতিক আছে; সে চলে গিয়েছিল রাজবাড়ি থেকে কিছু দূরে বাজারের মধ্যে একটা মদের দোকানে। সন্ধ্যা হলেই সে নাকি নেশা না করে পারে না।

এদিকে অন্য দু'জন দস্যু তৈরি হয়ে বসে আছে, এবার জগু ওস্তাদকে মেক-আপ করে পোশাক পরে ছগনলাল সাজতে হবে। কাজেই আরও প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল। বিশুদা এর মধ্যে একবার জিজ্ঞেস করে গেছে আমি বাড়ি যেতে চাই কিনা। আমার কিন্তু সব ব্যাপারটা ভীষণ ভাল লাগছে, তাই বলে দিলাম যে দস্যুদের শট না দেখে ফিরব না।

শট হতে হতে হয়ে গেল সাড়ে ন'টা। তিন গুণ্ডা রাজবাড়ির পাঁচিলের বাইরে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। পাঁচিলটা উঁচু হওয়াতে রাজবাড়ির শুধু চুড়োটা দেখা যাচ্ছে। তাই ছগনলাল তরতরিয়ে গাছে উঠে যায়। আর তার দেখাদেখি অন্য দু'জন গুণ্ডাও। এবার তারা অমৃৎকে দেখতে পায়। ঠিক এই সময় একজন টহলদার সেপাই এসে পড়ে। তার হাঁক শুনে তিন গুণ্ডা গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে গিয়ে তাদের গাড়িতে উঠে পালায়।

শুটিং দেখে এটা বুঝতে পারলাম যে নেশাই করুক আর যাই করুক, জগু ওস্তাদ অ্যাকটিং-এ দারুণ পাকা। বিশুদা পরে বলেছিল, 'লোকটা মারাত্মক অভিনেতা। তাই ওর শত বদখেয়াল সত্ত্বেও ওকে না নিয়ে উপায় নেই।' আমি মনে মনে বললাম, 'আর যাই করো বাবা, আমার সঙ্গে অ্যাকটিং করার সময় নেশা করে এসো না। আমি শুনেছি মদের গন্ধ ভয়ানক খারাপ।'

॥ ৫ ॥

শুটিং থেকে রাত করে ফিরে বেশ ক্লান্ত লাগছিল, তাই খেয়ে নিয়েই শুতে চলে গেলাম। আগামীকাল অত ভোরে ওঠার দরকার নেই, কারণ সকালে শুধুই পুষ্করের মেলার ভিড়ের শট নেওয়া হবে, তাতে কোনও অভিনেতার দরকার হবে না। মেলা শুরু হবে কাল থেকেই, কাজেই খুব বেশি ভিড় হবার আগে কিছু শট নিয়ে রাখা দরকার। সন্ধেবেলা আবার কাজ আছে রাজবাড়িতে। এবারে হিরো শঙ্কর মল্লিককে লাগবে। দৃশ্যটা হচ্ছে—রাজা পুলিশে খবর দেবার পর ইনস্পেক্টর সূর্যকান্ত এসে অমৃৎকে জেরা করে সব ব্যাপারটা জেনে নিচ্ছে। কাজেই আমারও কাজ আছে, আর পুলকেশ ব্যানার্জিরও আছে।

ওঠার তাড়া না থাকলেও সাতটার বেশি বিছানায় শুয়ে থাকতে পারলাম না। এক হিসেবে ভালই হল। কারণ বারান্দায় বেরিয়েই বিশুদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিশুদা বলল, 'তুই আমাদের সঙ্গে আসবি?'

আমি বললাম, 'কোথায়?'

'জায়গাটার নাম দৌরাল। এখান থেকে ষোলো কিলোমিটার দূর। গল্পের মতো একটা নালা পাওয়া গেছে, সেটা কৃষ্ণণকে দেখিয়ে দেব। ও একবার পরখ করে দেখতে চায় মোটর সাইকেলে টপকে পেরোনো যায় কিনা।'

'স্টান্টম্যান এসে গেছে?'

'আর বলিস না!' বলল বিশুদা, 'ট্রেন প্রায় তিন ঘণ্টা লেট। কৃষ্ণণকে নিয়ে আমি ফিরেছি প্রায় রাত দেড়টায়।'

'তার মানে মোটর সাইকেলও থাকবে আমাদের সঙ্গে?'

'তা থাকবে বইকী! সেটা যাবে বাসের মাথায়। ওখানে গিয়ে চড়বে কৃষ্ণণ।'

'কৃষ্ণণ কোন দেশি লোক বিশুদা? ম্যাড্রাসি?'

'সেটা দেখলেই বুঝতে পারবি।'

আটটার মধ্যে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল। আজ বাস ছাড়া কিছুই যাচ্ছে না, কারণ তিনটে গাড়িই পুষ্কর চলে গেছে শুটিং-এ। তবে আউটিং-এ অনেকেরই উৎসাহ। তাই যারা শুটিং-এ যায়নি তারা প্রায় সকলেই বাসে উঠে পড়ল। সবশেষে বিশুদার সঙ্গে এল একজন লোক যার বছর ত্রিশেক বয়স, গায়ের রঙ মোটামুটি পরিষ্কার, আর হাইট মাঝারির চেয়ে একটু বেশি। ভদ্রলোকের শরীর যে অত্যন্ত ফিট সেটা তার হাঁটাচলা দেখলেই বোঝা যায়।

'স্টান্টম্যান-স্টান্টম্যান করছিলি—ইনিই ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ', বলে বিশুদা ভদ্রলোককে আমার পাশের খালি সিটে বসিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ আমার দিকে চেয়ে ঝলমলে দাঁত বার করে হেসে পরিষ্কার

বাংলায় বললেন, 'নমস্কার।'

আমি তো অবাক! ভাবতেই পারিনি যে কৃষ্ণণ বাঙালির নাম হতে পারে।

বাসের মাথায় মোটর সাইকেল চড়ে গেছে, দু'বার হর্ন দিয়ে ডিলাক্স বাস রওনা দিয়ে দিল।

বাসের সবাই ঘুরে ঘুরে নতুন-আসা স্টান্টম্যানের দিকে দেখছে; আমার চোখটাও চলে গেল তাঁর দিকে। ভদ্রলোক এখনও মিটিমিটি হাসছেন। শেষে আর না থাকতে পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বাঙালি বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু আপনার নাম তো—?'

'আমার নাম কৃষ্ণপদ সান্যাল', হেসে বললেন ভদ্রলোক, 'বম্বেতে বাঙালি স্টান্টম্যানকে কেউ পাত্তা দেয় না, তাই একটা দক্ষিণী নাম নিয়েছি। ওখানে ভাঙাভাঙা হিন্দি আর ইংরেজি বলি। কথা তো বলতে হয় না বেশি—আমাদের কথায় কেউ কান দেয় না, শুধু দেখে কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা!'

আমার অদ্ভুত লাগছিল ভদ্রলোককে দেখে। ইনিই শঙ্কর মল্লিক হয়ে সব কঠিন প্যাঁচের কাজগুলো করবেন, আর লোকে ছবি দেখে ভাববে সব বুঝি শঙ্কর মল্লিকই করছেন। বিশুদা বলছিল, হিন্দি ছবির হিরোরা যত ফাইটিং করে, যত ঘোড়া থেকে পড়ে, যত এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি লাফ মেরে চলে যায়—সবই আসলে করে স্টান্টম্যানরা, কিন্তু বাইরের লোকে সেটা জানতেও পারে না।

আমি আরেকবার আড়চোখে চাইলাম ভদ্রলোকের দিকে। কৃষ্ণপদ সান্যাল। তার মানে ব্রাহ্মণ। তাদের বাড়ির ছেলে স্টান্টম্যান হল কী করে? এসব তো জানতে হবে ভদ্রলোকের কাছ থেকে। এটা বেশ বুঝছি যে, একে একটা গোঁফ লাগিয়ে দিলে একটু দূর থেকে শঙ্কর মল্লিকের সঙ্গে বেশি তফাত করা যাবে না। দু'জনের গায়ের রঙ আর গড়ন মোটামুটি একই রকম। বিশুদার বাছাইয়ের প্রশংসা করতে হয়। সে-ই যে এই স্টান্টম্যানকে জোগাড় করে এনেছে সেটা জানি।

'তোমার নাম কী?'

নাম বললাম। তারপর বললাম, 'আমাকে তো বোধহয় আপনার পিছনে বসতে হবে মোটরবাইকে।'

'তা বসবে', বললেন ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ, 'ভয়ের কোনও কারণ নেই। মোটর সাইকেলের স্টান্ট আমার মতো কেউ করতে পারে না। বাইশটা হিন্দি-তামিল ছবিতে আমি মোটর সাইকেল চালিয়েছি, একবারও গড়বড় হয়নি।'

'তাই বুঝি?'

'ইয়েস স্যার।'

ভদ্রলোককে দেখে কেন জানি বেশ ভাল লাগছিল। চেহারার মধ্যে এমন একটা নির্ভীক ভাব চট করে দেখা যায় না। আর এমন পরিষ্কার হাসি যে মানুষের, তার মধ্যে কোনও নিচুভাব থাকতে পারে কি? মনে তো হয় না।

ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ গুনগুন করে হিন্দি গানের সুর ভাঁজছেন দেখে আমি আর কোনও কথা বললাম না। ভাল করে আলাপ করার অনেক সময় আছে। নালা টপকানোর শুটিংটা হবে দু' সপ্তাহ পরে, সেটা আমি জেনে নিয়েছি।

দৌরাল একটা ছোট্ট শহর। সেটা ছাড়িয়ে বাস আরও কিছুদূর যাবার পর বিশুদা এক জায়গায় থামতে বলল। বাঁয়ে বনের মধ্যে দিয়ে একটা পায়ে হাঁটা পথ চলে গিয়েছে। বুঝতে পারলাম সেটা দিয়ে আর বাস যাবে না, আর সেটা দিয়েই আমাদের যেতে হবে। এইসব জায়গা বাছার জন্য সুশীলবাবু বিশুদা আর ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে গত মাসেই একবার আজমীর ঘুরে গেছেন। জায়গা বাছার কাজটা সবসময় আগেই সেরে নিতে হয়; শুটিং একবার আরম্ভ হয়ে গেলে তখন আর অন্য কিছুর সময় থাকে না। এই নালাটা ডিরেক্টর সাহেবের পছন্দ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যাকে মোটর সাইকেল করে এটা টপকে পেরোতে হবে তারও তো পছন্দ হওয়া চাই!

বিশুদা বলল, জায়গাটা বড় রাস্তা থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটাপথ। জিপে করে অনায়াসেই যাওয়া যায়, এমনি গাড়ি বা বাসে সম্ভব নয়।

আমরা বাস থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। মোটর সাইকেলটাও নামানো হয়েছে; ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ তাতে চড়ে বিকট আওয়াজ তুলে স্টার্ট দিয়ে আমাদের পাশে-পাশেই চললেন।

পাতলা বন, গাছপালাগুলো সব অচেনা, এ দৃশ্যের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের কোনও মিল নেই।

ক্রমে বড় রাস্তার গাড়ি চলাচলের শব্দ একেবারে মিলিয়ে এল। এখন শুধু মোটর সাইকেলের শব্দ আর পাখির ডাক।

মিনিটখানেক পরে একটা কুলকুল শব্দ পেলাম। বুঝলাম নালা এসে গেছে। এখানে পথটা একটু চওড়া আর একটু চড়াই। খানিকদূর চড়াই গিয়ে রাস্তাটা হঠাৎ ঢালু নেমে গিয়ে একেবারে নালায় পড়েছে। নালাটা হাত দশেক চওড়া হলেও মোটর সাইকেলকে লাফিয়ে পার হতে হবে প্রায় বিশ পঁচিশ হাত, তা হলে ঠিক এদিকে চড়াই-এর মুখ থেকে ওদিকে উতরাইয়ের মুখে গিয়ে পড়বে।

'কী কাপ্তেন, কী মনে হচ্ছে?'

বিশুদা ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল। কৃষ্ণণ ইতিমধ্যে বাইক থেকে নেমে সেটাকে দাঁড় করিয়ে নালা আর রাস্তাটাকে ঘুরে ঘুরে দেখছে।

'দাঁড়ান, একবার ওপারটা দেখে আসি।'

কৃষ্ণণ ঢাল দিয়ে নেমে জলের ধারে গিয়ে প্যান্টটাকে গুটিয়ে খানিকটা উপরে তুলে ছপ্ ছপ্ করে জল পেরিয়ে ওপারে চলে গেলেন। মিনিটখানেক ওদিকটা দেখার পর আবার এদিকে ফিরে এসে বললেন, 'আমি একবার ট্রাই করে দেখব। আপনারা একটু পাশে সরে দাঁড়ান।'

দলের সবাই হুড়মুড় করে নালার ধারে নেমে রাস্তার দু'পাশে ভাগ হয়ে দাঁড়াল। আমি বাঁ দিকের দলের সঙ্গে রয়েছি, আমার চোখ রাস্তার দিকে। কৃষ্ণণ ইতিমধ্যে আবার ওপরে ফিরে এসে মোটর সাইকেলের দিকে এগিয়ে গেছে। রাস্তার দু'পাশে ঝোপ থাকার জন্য কৃষ্ণণকে আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ফটফটানি শোনা যাচ্ছে। আওয়াজ যেভাবে কমে আসছে তাতে বুঝতে পারছি কৃষ্ণণ বাইকটাকে বেশ দূরে নিয়ে যাচ্ছেন স্পিড তোলার সুবিধার জন্য।

'রেডি হলে বলবেন!' হাঁক দিল বিশুদা।

কয়েক সেকেন্ড পরেই উত্তর এল—

'রেডি! আই অ্যাম কামিং।'

এবার বাইকের শব্দটা ক্রমে বেড়ে যাওয়াতে বুঝতে পারলাম সেটা রওনা দিয়েছে। রওনা দেওয়া, আর ঝোপের পিছন থেকে হঠাৎ ম্যাজিকের মতো বেরোনো—এই দুটো অবস্থার মধ্যে ব্যবধান বড়জোর তিন সেকেন্ডের। আর তার পরেই ঘটল তাক লাগানো ব্যাপারটা। একটা হিংস্র, ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অনায়াসে দশ হাত দূরে তার শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে, সেইভাবে,

আর ঠিক সেই রকম সহজে আর সতেজে ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণের মোটরবাইক শূন্য দিয়ে লাফিয়ে নালা টপকে উলটোদিকের উতরাইয়ের মুখটাতে পড়ে গড়গড়িয়ে নেমে ওদিকের ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এর পরে একটাই জিনিস হবার ছিল, আর হলও তাই। দলের সব কটি লোক একসঙ্গে হাততালি দিয়ে কৃষ্ণণের এই আশ্চর্য স্টান্টের তারিফ করল।

কিন্তু এইখানেই খেলার শেষ নয়। এর পরে যেটা হল সেটা আমি সারাজীবন ভুলতে পারব না। ওপার থেকে হঠাৎ কৃষ্ণণের ডাক শোনা গেল।

'মাস্টার অংশুমান।'

আমি আমার নামটা শুনে হঠাৎ কেন জানি থতমত খেয়ে গেলাম। অংশুমান যেন আমি নই; নামটা যেন অন্য কারুর।

'কোথায়—মাস্টার অংশুমান!' আবার এল ডাক।

এদিকে বিশুদা আমার দিকে এগিয়ে এসেছে।

'তোকে ডাকছে—তুই যাবি?'

'যাব।'

হঠাৎ মনের সমস্ত ভয় যেন ম্যাজিকের মতো উবে গেল। আমার মন বলল, ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ যেখানে সারথি সেখানে ভয়ের কিছু থাকতে পারে না।

আমি চেঁচিয়ে বলে দিলাম, 'এক্ষুনি আসছি।' তারপর প্যান্ট তুলে নালা পেরিয়ে হাজির হলাম ওপারে। বিশ হাত দূরে ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ বসে আছেন বাইকে; আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

'রিহার্সালটা হয়ে যাক!'

আমি এগিয়ে গেলাম ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণের দিকে। ভদ্রলোক ক্যারিয়ারের উপর একটা চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিলেন আমায় কোথায় বসতে হবে। আমি বসলাম।

'কিচ্ছু ভয় নেই; শুধু আমার কোমরটাকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরবে।'

আমি ধরলাম। ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ বাইকটাকে ঘুরিয়ে আরেকটু দূরে নিয়ে গেলেন। তারপর আবার নালার দিকে ঘুরিয়ে এঞ্জিনে একটা হুঙ্কার দিয়ে বাইকটা ছেড়ে দিলেন।

কোমর জড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি কিছুই দেখিনি, শুধু জানি যে যখন চোখ খুললাম তখন আমি উলটো পারে চলে এসেছি, আমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে, আর সকলে নতুন করে হাততালি দিচ্ছে আর শাবাশ শাবাশ বলছে।

'কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ।

আমি বললাম, 'দারুণ মজা, দারুণ আরাম।'

'যাক, আর কোনও ভাবনা নেই। কাল স্টেশন থেকে আসার পথে বিশুবাবু বলেছিলেন সিনটার কথা। আমি বললাম, কোনও চিন্তা নেই। ছেলেটি যদি সাহস করে বাইকে চড়তে পারে তা হলে আমার দিক দিয়ে কোনও গড়বড় হবে না।'

এর মধ্যে আরও অনেকে আমাদের কাছে এসে পড়েছে। সুশীলবাবু পুষ্করে শুটিং করছেন, নাহলে উনিও নিশ্চয় খুবই খুশি আর নিশ্চিন্ত হতেন। শঙ্কর মল্লিক আমার পিঠ চাপড়ে 'ব্রেভ বয়' বলে তারিফ করলেন, তারপর কৃষ্ণণের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমার এই স্টান্টের ব্যাপারে সত্যিই চিন্তা ছিল। জানি আমাকে এসব কিছুই করতে হবে না, কিন্তু যে করবে তাকে মানাবে কিনা সেইটেই ছিল ভাবনা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার মতো একটা গোঁফ লাগিয়ে দিলে একটু দূর থেকে বা পিছন থেকে কেউ আর তফাতই করতে পারবে না।'

যে কাজের জন্য আসা হয়েছিল সেটা হয়ে গেছে বলে সবাই আবার বাসে উঠল। বারোটার মধ্যে সার্কিট হাউসে দুপুরের খাওয়া সেরে যেতে হবে মিঃ লোহিয়ার বাড়ি।

নালা টপকানোর ব্যাপারে রিহার্সালটা এভাবে উতরে যাওয়াতে আমার যে কী নিশ্চিন্ত লাগছে তা বলতে পারি না। সমস্ত ছবিটাতে এটাই আমার সবচেয়ে কঠিন কাজ, আর এটা নিয়েই ছিল সবচেয়ে বেশি ভাবনা। ভাগ্যিস কৃষ্ণণকে পাওয়া গিয়েছিল! ভাল স্টান্টম্যান যে কী জিনিস সেটা আজ প্রথম বুঝলাম।

॥ ৬ ॥

বিকেল পাঁচটার মধ্যে মিঃ লোহিয়ার বাড়িতে দুপুরের কাজটা হয়ে গেল। আমার মন সবচেয়ে খুশি আছে এই কারণে যে, আমার ভুলের জন্য বারবার একই শট নিতে হচ্ছে না। আমি বুঝেছি যে ক্যামেরার ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। হিরো শঙ্কর মল্লিকও প্রথম দিনে ভালই অ্যাকটিং করেছেন। এই একজনের সম্বন্ধে কেউ কিছুই জানত না, কারণ ইনিও নতুন লোক। পরে শঙ্করবাবু নিজেই বলেছিলেন যে উনি নাকি ছবির পোকা; বহু ভাল বিদেশি ছবিতে বিদেশি অ্যাকটরদের অভিনয় দেখেছেন। তাতে নিশ্চয়ই অনেকটা সাহায্য হয়েছে, কারণ উনি যেটা করলেন সেটাকে প্রায় অ্যাকটিং বলে মনেই হয় না। আজ শুটিং দেখতে এখানকার একজন সত্যিকারের পুলিশ ইনস্পেক্টর ছিলেন। এঁর নাম মিঃ মাহেশ্বরী, মিঃ লোহিয়ার খুব চেনা। তিনি সব দেখে-টেখে খুব তারিফ করে গেলেন।

সন্ধ্যায় সার্কিট হাউসে ফিরে এসে আবার ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা হল। সারা দুপুরে আমার অনেকবার মনে হয়েছে ভদ্রলোকের কথা, আর সেইসঙ্গে সকালের তাক-লাগানো ঘটনাটা। এটা জানি যে, মা-বাবা এখানে থাকলে কখনওই এ জিনিস করতে দিতেন না। বিশুদা বলে দিয়েছে—'বাড়িতে যখন চিঠি লিখবি, খবরদার এই স্টান্টের কথাটা লিখবি না। ওটা কাকা-খুড়িমা একেবারে ছবি দেখতে গিয়ে জানতে পারবেন, তার আগে নয়। জানলে সব দোষ পড়বে আমার ঘাড়ে।'

'কীরকম কাজ হল?' ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণ জিজ্ঞেস করলেন।

'খুব ভাল। তবে সকালের নালার কাজের চেয়ে ভাল নয়।'

'একটা কথা বলছি তোমায়', বললেন কৃষ্ণণ, 'আমাকে এবার থেকে কেষ্টদা বলে ডাকবে। ওটাই

আমার আসল নাম। তোমাদের কাছে তো নিজেকে মাদ্রাজি বলে পরিচয় দেবার কোনও কারণ নেই।'

এই ভাল। আমার নিজেরও ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণকে দাদা বলতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু কীভাবে শুরু করব সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, সেটা এই বেলা বলে ফেললাম।

'তুমি কী করে এই স্টান্টম্যানের কাজে ঢুকলে কেষ্টদা?'

'সে অনেক ব্যাপার', বলল কেষ্টদা, 'আমি পণ্ডিতের বাড়ির ছেলে। আমার বাড়ি কোন্নগর। বাপ ছিলেন ইস্কুলে সংস্কৃত আর অঙ্কের মাস্টার। বোধহয় এখনও আছেন। আমি ছিলুম ইস্কুল-পালানো ছেলে। ক্লাস কামাই করে হিন্দি ফাইটিং-এর ছবি দেখতে যেতুম, আর বাবার কাছে বেদম মার খেতুম। লাঠির বাড়ি। কিন্তু তখনই একটা কায়দা শিখেছিলুম; পিঠে লাঠি পড়লেও তেমন ব্যথা লাগত না। আমার বাবা যে খুব ষণ্ডা লোক ছিলেন তা না। সে ছিলেন আমার ঠাকুরদা। তিনিও সংস্কৃতের পণ্ডিত, কিন্তু ব্যায়াম করতেন রেগুলার। মুগুর ভাঁজা। একবার একটা মেড়া শিং বাগিয়ে তাড়া করেছিল ঠাকুরদাকে। উনি উলটে মেড়ার দিকে তেড়ে গিয়ে তার শিং দুটো ধরে মট করে ভেঙে দেন। বুঝে দেখো কেমন জোর। আমিও ব্যায়াম করেছি, তবে বেশি মাসল হলে স্টান্টের ব্যাপারে অসুবিধা হয়। বডিটা হবে স্প্রিং-এর মতো। মাটিতে পড়ার সময় হাড়গোড় সব আলগা দিতে হবে, তাতে হাড়ে চোটটা কম লাগবে। কম করে পাঁচশো বার পড়েছি ঘোড়ার পিঠ থেকে গত দশ বছরে। চোট যে একেবারেই লাগেনি তা নয়; সারা গায়ে ছড়ে যাওয়ার দাগ রয়েছে। কিন্তু শটের সময় কেউ কোনওদিন বুঝতে পারেনি চোট লাগল কিনা।'

কেষ্টদা একটু থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার শুরু করল।

'তেরো বছর বয়সে ইস্কুল ছাড়ি। বাবা হাল ছেড়ে দেন। আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় গিয়ে শেয়ালদার টাওয়ার হোটেলে বয়ের কাজ নিই। পাঁচ বছর সেই কাজ করে একশো ছাপ্পান্ন টাকা জমিয়ে একদিন ফস করে থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে বম্বে মেলে উঠে পড়লুম। দু'দিন লাগল বম্বে পৌঁছতে। গমগমে শহর, কাউকে চিনি না, কেবল জানতুম বম্বে টকিজ। গিয়ে শুনলুম বম্বে টকিজ আর নেই। কোথায় যাব? ঘুরতে ঘুরতে একে-ওকে জিজ্ঞেস করে শেষটায় প্যারোলে রাজকমল স্টুডিওতে গিয়ে হাজির হলুম। শুনলুম বাঙালি ডিরেক্টর স্বদেশ মুখার্জি শুটিং করছেন। সোজা গিয়ে ঢুকে পড়লুম স্টুডিওর ভেতর। চুপ করে একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

'লাকটা যে ভাল ছিল সেটা এই ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবে। হিরো আর ভিলেনে মারপিটের সিন হচ্ছিল। দু'জনের জায়গাতেই স্টান্টম্যান কাজ করছে। হিরোর স্টান্টম্যানকে পেটে লাথি খেয়ে ছিটকে মেঝেতে পড়তে হবে। যেমন-তেমন ভাবে ছিটকে পড়ে যাওয়ার প্র্যাকটিস কলকাতায় থাকতে হোটেলের ছাতে অনেক করেছি। এখানে সেটা কীভাবে হয় দেখবার জন্য লুকিয়ে আছি। যেটা হল সেটা এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার। হিসেবের সামান্য গণ্ডগোলে ছিটকে পড়ার সময় হিরোর স্টান্টম্যানের মাথাটা লাগল একটা টেবিলের কোণে। ব্যস, ব্ল্যাক আউট। তাকে চ্যাংদোলা করে সেট থেকে বার করে নিতে হল। এদিকে ডিরেক্টরের মাথায় হাত, প্রোডিউসারের মাথায় হাত। স্টান্টম্যান ছাড়া কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। একদিন বন্ধ হলে বিশ হাজার টাকা লোকসান। যা থাকে কপালে করে ডিরেক্টরের কাছে গিয়ে ধরে পড়লুম। ভাঙা ভাঙা হিন্দি-ইংরিজি মিশিয়ে বললুম, আমার নাম উন্নি কৃষ্ণণ, আমি মালাবারের লোক, স্টান্টম্যান। আমাকে দিয়ে পরীক্ষা করা হোক।

'এমনই সংকটের অবস্থা যে আমি যে কাউকে না বলে শুটিং দেখতে ঢুকেছি, তার জন্য কেউ কিছু বলল না। ডিরেক্টর সাহেব তক্ষুনি বললেন যে, একে নিয়ে একটা রিহার্সেল হোক, উতরে গেলে একে দিয়েই কাজ করানো হবে।

'দাঁত কামড়ে নেমে পড়লুম। রিহার্সেল পার্ফেক্ট, টেক পার্ফেক্ট। সেইদিন থেকে স্টান্টম্যান ক্যাপ্টেন কৃষ্ণণের জন্ম। তবে এটা জেনেছি যে একাজে নাম হয় না। ফাইটিং-এর ছবি দেখে কেউ জিজ্ঞেসও করে না কে স্টান্টম্যান ছিল। তবে পেট চলে যায়, কারণ কাজের অভাব নেই। যত দিন যাচ্ছে, ছবিতে স্টান্ট ততই বেড়ে যাচ্ছে। একটা ছবিতে হেলিকপ্টারের তলায় দড়ি ধরে ঝুলতে হয়েছিল। ওয়ান স্টান্ট, টোয়েন্টি ফাইভ থাউজ্যান্ড রুপিজ। প্রাণ হাতে নিয়ে কাজ করা তো! প্রতি স্টান্টেই জান লড়িয়ে দিতে

হয়, কারণ একটু এদিক-ওদিক হলেই, মৃত্যু না হোক, মারাত্মক জখম হতেই পারে। দেখলেই তো সকালে, ব্যাপারটা কত রিস্কি। একটু গড়বড় হলে কী হত ভাবতে পারো?'

ভাবতে পারি, কিন্তু ভাবতে চাই না। আমি জানি যে আমার ভাগ্যটা এখন লটকে গেছে কেষ্টদার ভাগ্যর সঙ্গে। সেখান থেকে পিছোনোর কোনও উপায়ও নেই, ইচ্ছেও নেই।

পাহাড়ের পিছনে সন্ধ্যার আকাশ থেকে শেষ রঙটুকু মুছে গেল। লেকের জল কালচে নীল। হাঁসগুলিকে এখনও দেখা যাচ্ছে, একটু পরে আর যাবে না। ভিতরে সকলে তাস খেলতে বসে গেছে। সেটা মাঝে মাঝে হই-হুল্লোড় থেকে বোঝা যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি তাস খেলো না কেষ্টদা?'

'খেলি,' বলল কেষ্টদা, 'আজ দুপুরেই খেলছিলাম। ভাল কথা—তোমাদের দলের একজন—তাকে জগু ওস্তাদ বলে ডাকে—সে কে বলো তো?'

'সে তো দস্যু দলের নেতা সাজছে। ও বেশ নামকরা অ্যাক্টর। আসল নাম জগন্নাথ দে।'

'আমি আবার ছাই বাংলা ছবি প্রায় দেখিইনি গত দশ বছরে।'

'কিন্তু ওর কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে কেন?'

'কারণ তাসের দলে ও-ও ছিল। ওই আমাকে ডেকে নিল, আমি ঘরে বসে ছিলাম। লোকটা গোলমেলে। সাংঘাতিক জোচ্চোর। কিন্তু আমার চোখে তো ধুলো দিতে পারবে না, একবারের পর দ্বিতীয়বারেই ধরে ফেলেছি। তাতে লোকটা যেরকম ভাব করল সেটা মোটেই ভাল লাগল না। এরকম মুখ-খারাপ করতে আমি খুব কম লোককে শুনেছি। ও লোক সুবিধের নয়।'

সেটা যে আমার জানতে বাকি নেই সেটা গতকালের ঘটনা বর্ণনা করে আমি বুঝিয়ে দিলাম।

'হুঁ...' বলে কেষ্টদা কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে ভুরু কুঁচকে রইল। তারপর বলল. 'তোমার মা-বাবা নেই কলকাতায়?'

আমি বললাম, 'আছেন। আর আমার এক দিদি আছেন, তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'মা-বাবাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না?'

'উঁহুঁ। বিশেষ করে এখন তুমি আসাতে আর হচ্ছে না।'

'গুড। কাজটা যাতে ভাল হয় সেটাই দেখতে হবে। খুব মন দিয়ে কাজ করবে। আর করলে তুমি নাম করবে সেটা আমি পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'শুধু আমি কেন, তুমিও করবে!'

কেষ্টদা মাথা নাড়ল।

'উঁহুঁ। স্টান্টম্যানদের নামের মোহ কাটাতে হয়। নাম করলে করবে তোমাদের হিরো, আর তাতেই যা আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন।'

কেষ্টদা উঠে পড়ল।

'যাই দেখি কোনও তাসের দলে ঢুকতে পারি কিনা।'

॥ ৭ ॥

তিনদিন পরে আমার সবচেয়ে মজাদার শুটিং হল পুষ্করের মেলায়। আজ প্রথম আমাকে দুটো পার্টে অভিনয় করতে হল। মোহন আর অমৃতের কথা বলার দৃশ্য দু'বার করে তুলতে হল। প্রথমবার আমি মোহন সাজলাম, আর আমার সামনে অমৃতের জায়গায় দাঁড়াল শ্যামসুন্দর বলে আজমীর থেকেই নেওয়া একজন বারো বছরের ছেলে। দ্বিতীয়বার আমি সাজলাম অমৃৎ, আর সেই একই শ্যামসুন্দর দাঁড়াল মোহনের জায়গায়। দৃশ্যটা যখন লোকে পর্দায় দেখবে তখন কিন্তু শ্যামসুন্দরকে দেখাই যাবে না; তার বদলে দেখা যাবে মোহন আর অমৃৎ কথা বলছে।

কিডন্যাপিং-এর দৃশ্যটা যেখানে নেওয়া হল সেখানে মেলার কোনও ভিড় ছিল না; থাকলে খুব মুশকিল হত। জগু ওস্তাদ দিনের বেলা নেশা করেন না। তাই তিনি ছগনলালের পার্টে কাজটা ভালই করলেন। তবে যেখানে ছগনলাল অমৃৎবেশী মোহনকে কোলপাঁজা করে তুলে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে

ফেলছে সেটা জগু ওস্তাদ আরেকটু সাবধানে করতে পারতেন। শটটা নেওয়ার পরে আমার কোমরে যে ব্যথাটা আরম্ভ হল, সেটা ছিল প্রায় সন্ধ্যা অবধি।

সন্ধ্যাবেলা সার্কিট হাউসে ফিরে এসে কেষ্টদার সঙ্গে দেখা হল। গত দুদিন সকাল থেকে রাত অবধি সব শুটিংই রাজবাড়িতে হয়েছে। সেখানে কেষ্টদা ছিল, কিন্তু কাজের পরে আমার সঙ্গে আর কথাই হয়নি। রাত করে সার্কিট হাউসে ফিরে বেশ ক্লান্ত লাগায় দু'দিনই স্নান করে খেয়েই শুয়ে পড়েছি। আমার কৌতূহল ছিল জানবার জন্য এই দু'দিনে কোনও বলার মতো ঘটনা ঘটেছে কিনা। আজ সন্ধ্যায় সে-প্রশ্নের উত্তর পেলাম।

কেষ্টদা মুখে গুনগুন করে গান গাইলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম ওর মাথায় কী যেন একটা চিন্তা পাক খাচ্ছে, কারণ ওর ভুরুটা ছিল কুঁচকোনো।

'তোমাকেই খুঁজছিলাম', বলল কেষ্টদা।

'কী ব্যাপার?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ব্যাপার গুরুতর।'

'কেন বলো তো?'

'তোমরা তো এ-দু'দিন শুটিং করছিলে রাজবাড়িতে; আমার তো সারাদিন কাজ নেই, তাই এদিক-ওদিক ঘুরছিলুম। আজমীরের কিছু দেখবার জিনিসও দেখে নিলুম। কাল রাত্তিরে আটটা নাগাদ একবার গিয়েছিলুম বাজারে। ভাবলুম ঠাণ্ডা পড়েছে, গরম চায়ে একটু গলাটা ভিজিয়ে নিই। চায়ের দোকানটা তার আগের দিনই দেখা ছিল। যাই হোক, দোকানের বাইরে বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় পাশের দোকান থেকে দেখলাম দু'জন লোক বেরোলো। দোকানটা মদের। দুটো লোকের মধ্যে একটা হল তোমাদের জগু ওস্তাদ, আর আরেকটাকে রাজবাড়িতে দেখেছি। চাকরের কাজ করে। নাম বোধহয় বিক্রম। চাকরটাকে ওস্তাদের সঙ্গে দেখেই মনের ভেতর একটা সন্দেহ ধক করে উঠেছে। ওরা দু'জন কিন্তু বাইরে এসে চলে গেল না; কথা বলতে বলতে গেল দোকানের পিছন দিকে অন্ধকারে।

'কী ঘটছে জানার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ হওয়াতে আমিও বেঞ্চি ছেড়ে উঠে খুব সাবধানে এগিয়ে গেলুম যেদিকে ওরা গেছে সেইদিকে। দুটো দোকানের মাঝখানে একটা গোরুর গাড়ি দাঁড়ানো ছিল। সেটার পাশে গা ঢাকা দিয়ে কয়েক পা এগোতেই জগু ওস্তাদের গলা পেলুম। বুঝলুম সে বিক্রম লোকটাকে কোনও একটা কাজে সাহায্য করার কথা বলছে। সেটা করে দিলে জগু তাকে মোটা টাকা বকশিশ দেবে। কত টাকা সেই নিয়েও কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল, শেষটায় এক হাজারে রফা হল। বুঝতেই পারছ, রাজবাড়ি থেকে কিছু চুরি করার তাল করছে ওরা। চাকরটাই চুরি করে জিনিসটা জগু ওস্তাদকে এনে দেবে, আর তার জন্য এক হাজার টাকা পাবে।'

আমার কাছে এক ধাক্কায় সব জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল। নীলকান্তমণি। জগু ওস্তাদের সামনে অনেকবার মণিটার কথা হয়েছে। সেটা যে কত দামি তা সে জানে। সেইটে সে বিক্রমের সাহায্যে হাতাবার তাল করছে। আর সেটা জেনে গেছে কেষ্টদা।

নীলকান্তমণির ব্যাপারটা কেষ্টদাকে বলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি যে ওদের কথা শুনেছ সেটা ওরা টের পায়নি তো?'

'মনে তো হয় না', বলল কেষ্টদা, 'আমি বেশিক্ষণ থাকিনি। গোলমালটা কোথায় বুঝেই আমি সটকে পড়েছি। এখন কথা হচ্ছে, এ ব্যাপারে কী করা যায়?'

'তুমি কি মনে করো ব্যাপারটা বিশুদাকে বলা উচিত?' কেষ্টদা মাথা নাড়ল। 'তাতে সুবিধা হবে না। জগু ওস্তাদের কাজ এখনও বাকি আছে। ওর যদি একদিনও শুটিং না হত তা হলে ওকে বাদ দিয়ে অন্য লোক নেওয়া যেত। কিন্তু এখন ও কনটিনিউইটি হয়ে গেছে।'

'কী হয়ে গেছে?'

'কনটিনিউইটি। তার মানে ওকে নিয়ে তিনদিন কাজ হবার ফলে ও-ই ছগনলাল গুণ্ডা হয়ে গেছে। ওর বদলে অন্য লোক নিতে গেলে তাকে নিয়ে ওই তিনদিনের কাজ আবার নতুন করে করতে হবে। তাতে লাখ টাকা লোকসান। জগু লোকটা জোর পাচ্ছে শুধু এই কারণেই। ও জানে যে ওকে ছাড়া চলবে না। সেই সুযোগে লোকটা এই বদমাইশিটা করার তাল করছে।'

'তা হলে?'

'তা হলে মুখ বন্ধ করে বসে থাকা, আর প্রাণপণে আশা করা যাতে ওরা চুরিটা না করতে পারে। যে-মণিটার কথা বলছ সেটা কত বড়?'

'প্রায় একটা পায়রার ডিমের মতো।'

'কত দাম তা কিছু বলেছে?'

'বলেছে দামের কোনও হিসেব নেই। যাকে বলে অমূল্য।'

'বোঝো!'

কেষ্টদা গম্ভীর মুখ করে চলে গেল।

রাত্তিরে খাবার পর ঘুমোতে যাবার আগে একবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বাইরে ঝলমলে চাঁদনি রাত, লেকের জলটা চিকচিক করছে, এমন সময় একটা শব্দ শুনে পিছনে ফিরতে হল।

বারান্দায় লোক এসেছে।

জগু ওস্তাদ। আমি তো অবাক! লোকটা যে আমারই দিকে আসছে! আমার সঙ্গে ওর কী দরকার থাকতে পারে? আর এখন তো নেশা করেছে—সমস্ত বারান্দা দুর্গন্ধে ভরে যাবে।

না, গন্ধ তো নেই। আজ দিব্যি সুস্থ লাগছে ভদ্রলোককে।

'কেমন আছিস তুই?'

এ আবার কী প্রশ্ন!

আমি বললাম, 'কেন, ভালই তো আছি।'

'দুপুরে শট-এর পর দেখছিলাম কোমরে হাত বুলোচ্ছিস। বেশি চোট লাগেনি তো?'

'না, না। এখন আর ব্যথা নেই।'

'ভেরি গুড। ভাবনা হচ্ছিল তোর জন্য, তাই ভাবলাম একবার খোঁজ নিই।'

'আমি ভাল আছি।'

জগু ওস্তাদ চলে গেল।

আজ যে মানুষটাকে একদম অন্যরকম বলে মনে হল!

কেষ্টদা ঠিক শুনেছিল তো?

॥ ৮ ॥

আরও সাতদিন কেটে গেল।

এখন শুটিং-এর কাজটা বেশ মেশিন-মাফিক চলেছে। সবাইয়েরই সবকিছু সড়গড় হয়ে গেছে, তার ফলে কাজের স্পিডও বেড়ে গেছে। এর মধ্যে মা-বাবা দুজনেরই চিঠি পেয়েছি; আমার কাজ ভাল হচ্ছে জেনে দু'জনেই খুব খুশি।

বিশুদা ছাড়াও আরও কয়েকজন আছে যারা রোজই একবার এসে আমার খোঁজ নিয়ে যায়। তার মধ্যে অবিশ্যি মমতামাসি একজন। উনি বেশ বুঝতে পারেন মায়ের অভাব কী জিনিস। সত্যি বলতে কি, উনি থাকাতে সুবিধাই হয়েছে, না হলে সব জিনিস সবসময় খেয়াল করা মুশকিলই হত। এ ছাড়া আছেন সুশীলবাবু, যিনি এমনিতে একটু গম্ভীর মেজাজের লোক, কিন্তু তাও একবার অন্তত এসে 'কী, সব ঠিক তো?' কথাটা বলে যান। সুশীলবাবুর সহকারীদের মধ্যে মুকুল চৌধুরীকে আমার এমনিতেই ভাল লাগে, কারণ কাজের সময় আমার ব্যাপারে উনি খুব বেশিরকম দৃষ্টি রাখেন। একটা শট্-এ যদি আমার কুর্তার উপরের বোতামটা খোলা থাকে, তা হলে সেই দৃশ্যের অন্য সব শটেই সেটা খোলা থাকছে কিনা সেটা দেখার ভার মুকুল চৌধুরীর উপর।

কেষ্টদার ধারণা যে ভুল সেটা আমার মনে আরও দানা বাঁধল যখন দেখলাম পর পর এই সাতদিনেও জগু ওস্তাদের দিক থেকে কোনও গোলমাল দেখা গেল না। আমি এখনও সুযোগ পাইনি, কিন্তু পেলেই এ-কথাটা কেষ্টদাকে বলব বলে ঠিক করে রেখেছি।

সাতদিন অবিশ্যি ছবির কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। পুলকেশ ব্যানার্জি আর মমতামাসির কাজ আজ সকালেই হয়ে গেছে, ওঁরা আজ সন্ধ্যায় কলকাতা ফিরে যাবেন। ইতিমধ্যে মোহনের গরিব স্কুলমাস্টার বাবার পার্ট করার জন্য আজমীর থেকে একজন বছর চল্লিশেকের ভাল বাঙালি অ্যাকটর পাওয়া গেছে। এঁকে নিয়ে একদিনের কাজও হয়ে গেছে। কেষ্টদাকে কাজে লেগেছে এর মধ্যে তিনদিন, তার মধ্যে একদিন তাকে আরেকজন নতুন-আসা স্টান্টম্যানের সঙ্গে ফাইটিং করতে হয়েছে। আসলে ফাইটিংটা ছবিতে হবে ছগনলাল আর সূর্যকান্তের মধ্যে। তিনজনের মধ্যে একজন গুণ্ডা সূর্যকান্তের হাতে লাথি মেরে হাত থেকে পিস্তলটা মাটিতে ফেলে দিয়েছে। সেটা আবার পাবার জন্যই সূর্যকান্তকে ঘুঁষোঘুঁষি করতে হচ্ছে। ছগনলাল-বেশী জগু ওস্তাদ আর সূর্যকান্ত-বেশী শঙ্কর মল্লিককে গায়ে না লাগিয়ে ঘুঁষি চালানোর অ্যাকটিং করতে হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু যেখানেই ঘুঁষি খেয়ে ছিটকে পড়ার ব্যাপার আছে, সেখানেই অ্যাকটরের বদলে স্টান্টম্যান ব্যবহার করতে হয়েছে।

গুণ্ডাদের আস্তানার জন্য শহরের একটু বাইরে একটা তিনশো বছরের পুরনো পোড়ো বাড়ি পাওয়া

গিয়েছিল, তাতেই তোলা হয়েছে এইসব দৃশ্য। আমাকেও এ দৃশ্যে থাকতে হয়েছিল, কারণ মোহন তো গুণ্ডাদের হাতে বন্দি, আর তাকে উদ্ধার করতে এসেছেন ইনস্পেক্টর সূর্যকান্ত। হাত পা বাঁধা অবস্থায় ঘরের এক কোণে বসে আমাকে কষ্টের অ্যাকটিং করতে হয়েছে, যদিও স্টান্টম্যানদের কারসাজি দেখে আমার বুকটা বারবার কেঁপে উঠছিল। বিশেষ করে কেষ্টদার স্টান্টের তো কোনও তুলনাই নেই। এক-এক সময় মনে হচ্ছিল কেষ্টদার শরীরে বুঝি হাড় বলে কিছু নেই—নইলে এভাবে ছিটকে ছিটকে মাটিতে পড়ছে অথচ ব্যথা লাগছে না, এটা কীভাবে হয়?

আরও দু'দিন যে কাজ করেছে কেষ্টদা তার সবই হল মোটর বাইকে আমাকে নিয়ে। যদিও মোটরবাইককে মোটর গাড়ির তাড়া করার দৃশ্যটা ছবিতে থাকবে মাত্র দেড় মিনিট, তার জন্য শট নিতে হবে প্রায় ষাট-সত্তরটা। দৃশ্যটা শেষ হবে নালার উপর দিয়ে লাফের শট দিয়ে। সেটা নেওয়া হবে আরও সাতদিন পরে। সবচেয়ে কঠিন বলে কাজটা শেষের জন্য রাখা আছে। এই শটের পরে আমারও আর কোনও কাজ বাকি থাকবে না, কেষ্টদারও না।

এটা বলতেই হবে যে, অ্যাকটিং-এর ব্যাপারে জগু ওস্তাদের কোনও গাফিলতি নেই। তাই আমার সন্দেহ হচ্ছিল কেষ্টদা ঠিক শুনেছিল কিনা। পাঁচদিনের দিন সারাদিন মোটর সাইকেলে শুটিং করার পর সার্কিট হাউসে সন্ধ্যায় একটু ফাঁক পেয়ে কেষ্টদা নিজে থেকেই এল আমার কাছে। আমি তখন সবে স্নান করে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। আনা সাগর লেকটা রোজ দেখেও পুরনো হয়নি। আর পাহাড়ের পিছনে সূর্যোদয়টার এক-একদিন এক-একরকম বাহার।

'কী খবর?' বলল কেষ্টদা।

আমি বললাম, 'আমি তো তোমার কাছে খবর পাব বলে বসে আছি।'

'লোকটা বোধহয় হাল ছেড়ে দিয়েছে,' বলল কেষ্টদা, 'আমি ফাঁক পেলেই একবার সন্ধ্যার দিকে চায়ের দোকানটায় যাই। মাথায় চাদর মুড়ি দিয়ে বেঞ্চিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকি। আমায় চেনা যায় না নিশ্চয়ই। সেই অবস্থায় তিনদিন জগু ওস্তাদকে ঢুকতে দেখেছি মদের দোকানে। ওর সঙ্গে অন্য দু'জন গুণ্ডার একজনকে দেখেছি একদিন, কিন্তু সেই চাকর বিক্রম আর আসেনি।'

'তা হলে বোধহয় তুমি ভুল শুনেছিলে।'

কেষ্টদা মাথা নাড়ল।

'উঁহুঁ। আমার শোনায় ভুল হয়নি। ওরা যে একটা কোনও মতলব করছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর মধ্যে একদিন রাজবাড়িতে শুটিং-এর সময় আমার কোনও কাজ ছিল না, আমি ওদের বাড়ির একজন চাকরের কাছে একটা দেশলাই চেয়ে তার সঙ্গে একটু গল্প জুড়ে দিয়েছিলাম। সে বলল মিঃ লোহিয়ার যে খাস বেয়ারা সে নাকি ছুটিতে গেছে তিন হপ্তা হল। বিক্রম চাকরটা তার জায়গায় বদলি এসেছে। কাজেই সেখানে একটা গোলমাল আছে। এর বেলায় প্রভুভক্তির কোনও প্রশ্ন আসে না। এই লোকটাকে হাত করা তাই অনেকটা সহজ। আমার সন্দেহটা ওইখানেই। দেখা যাক; আর ক'দিন না গেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'কিন্তু সত্যি যদি কিছু হয়?'

কেষ্টদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'জানি না। যতদিন জগু ওস্তাদের কাজ আছে ততদিন আমাদের মুখ বন্ধ। সেই পাথরটা যদি চুরি যায়, তা হলে পুলিশ আসবে নিশ্চয়ই। পুলিশ যদি জগু ওস্তাদকে সন্দেহ করে তা হলে করবে—সেখানে আর কারুর কিছু বলার থাকতে পারে না। কিন্তু এটাও ঠিক যে, তা হলে তোমাদের ছবির সাংঘাতিক ক্ষতি হবে। পুলিশ দরকার বুঝলে অপরাধীকে পাকড়াও করবেই, তাদের কেউ রুখতে পারবে না। ভাবনা হচ্ছে ছবিটার জন্য। যতদূর জানি তোমার সঙ্গে জগু ওস্তাদের বেশ কিছু কাজ বাকি আছে।'

'তা তো আছেই। আমাকে ধরে নিয়ে যাবার পর গুণ্ডাদের আস্তানায় আমার তিনটে দৃশ্য আছে। তারা আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, ভাল করে খেতে দিচ্ছে না। আমাকে এক-পোশাকে দিনের পর দিন থাকতে হচ্ছে—এসব তো কিছুই তোলা হয়নি এখনও।'

'হুঁ...'

ছবিটা সম্বন্ধে কেষ্টদার এতটা দরদ আছে দেখে আমার আরও ভাল লাগল।

সত্যিই যে ভাবনার কারণ ছিল সেটা বোঝা গেল আটদিনের দিন সকালে।

সেদিন সকালে ন'টায় রাজবাড়িতে কাজ। আমি আর যিনি দেওয়ান সাজছেন, তাঁকে নিয়ে একটা দৃশ্য। পুলিশ গুণ্ডাদের খোঁজ করতে আরম্ভ করেছে, আর এদিকে রাজকুমার অমৃৎ তার নতুন বন্ধুর খবরের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। বড়দের বলে কোনও ফল না পেয়ে শেষটায় সে নিজেই ফোন করে ইনস্পেক্টরকে খবর জিজ্ঞেস করে। এই দৃশ্য তুলতে ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগা উচিত না। তারপর বাকি দিনটা কাজ হবে গুণ্ডাদের আস্তানায়।

সাড়ে সাতটার মধ্যে বাস বেরিয়ে পড়ল মালপত্র আর কিছু লোকজন নিয়ে। বিশুদাও চলে গেল সেই বাসে। বাকি সবাই গাড়িতে যাবে আটটার সময়। মিনিট কুড়ির মধ্যে দেখি একটা অটো-রিকশাতে করে বিশুদা ফিরে এসেছে। রাজবাড়িতে সাংঘাতিক কাণ্ড। গতরাত্রে ডাকাত পড়েছিল। মিঃ লোহিয়ার মাথায় বাড়ি মেরে তাঁকে অজ্ঞান করে তাঁর বালিশের নীচে থেকে চাবি বার করে সিন্দুক খুলে নীলকান্তমণিটা চুরি করে নিয়েছে। মিঃ লোহিয়ার স্ত্রী পাশের ঘরে দুই নাতিকে নিয়ে শুতেন, তিনি কিছুই টের পাননি। ভোরবেলা জ্ঞান হয়ে মিঃ লোহিয়া সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পেরে স্ত্রীকে ঘুম ভাঙিয়ে বলেন।

এটাও বিশুদা বলল যে, বাড়ির একজন চাকর বিক্রমকে নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। সে লোহিয়ার খাস বেয়ারা শত্রুঘনের বদলি হিসাবে এসেছিল একমাসের জন্য। পুলিশ এর মধ্যেই এসে সকলকে জেরা করতে শুরু করেছে। রাজবাড়িতে আরও তিনদিনের কাজ বাকি ছিল, সেটা করতে হবে একেবারে শেষদিকে—অন্য সব কাজ শেষ হয়ে যাবার পর।

আমি হন্তদন্ত হয়ে নীচে গিয়ে বিশুদার মুখ থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা শুনলাম। কেষ্টদাও ছিল সেই

ঘরে। সে খালি একবার আমার দিকে চাইল। আমি জানি যে এই ব্যাপারে আমাদের দু'জনেরই কিচ্ছু করার নেই, যদিও আমরা সবই জানি।

ফিল্মের দলের পঁচিশজন লোকের মধ্যে শুধু আমি আর কেষ্টদাই জানি আসল ব্যাপারটা, জানি নীলকান্তমণি কোথায় কার কাছে আছে।

॥ ৯ ॥

গুণ্ডাদের আস্তানার শুটিংটা বিকেল সাড়ে চারটায় শেষ করে ফেরার পথে বিশুদা বলল, 'চল অংশু, আমরা ক'জন একবার মিঃ লোহিয়াকে দেখে আসি। ভদ্রলোক কেমন আছেন জানা দরকার।'

একটা গাড়িতে বিশুদা, সুশীলবাবু, শঙ্কর মল্লিক, সুকান্তবাবু আর আমি গেলাম রাজবাড়িতে।

বাড়ির বাইরে পুলিশ, ভিতরে পুলিশ—সারা বাড়ির চেহারাই পালটে গেছে। বাড়ির লোকজন সকলেরই মুখ গম্ভীর, সবাই ধীরে ধীরে হাঁটছে, ফিসফিস করে কথা বলছে—দেখে মনে হয় যেন সারা বাড়িটার ওপর শোকের ছায়া পড়েছে। তার উপরে আবার আজ দিনটাও করেছে মেঘলা।

তবু ভাল যে মিঃ লোহিয়ার মাথার জখমটা তেমন গুরুতর হয়নি। ভদ্রলোক দোতলার সামনে বারান্দায় মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আরাম কেদারায় বসে ফলের রস খাচ্ছিলেন। আমাদের বসতে বলে পাশে দাঁড়ানো চাকরকে সকলের জন্য শরবত আনতে বললেন। সুশীলবাবু বললেন, 'আমরা কিন্তু আপনাকে মোটেই বিরক্ত করতে চাই না। আপনার এই দুর্ঘটনার কথা শুনে আপনি কেমন আছেন খালি সেইটুকু দেখতে এসেছি।'

'আই অ্যাম মাচ বেটার,' বললেন মিঃ লোহিয়া, 'কী করব বলুন, মানুষের জীবন তো আর সবসময় একরকম যায় না। কপালে দুর্ভোগ ছিল, সে কে পারে খণ্ডাতে? আফসোস হয় যে, আমার এত হিরে জহরত থাকতে সে লোক আমার সাধের মণিটাই নিল।'

'এটা কি আপনার ওই চাকরেরই কীর্তি?' প্রশ্ন করলেন সুশীলবাবু।

'সে যখন পালিয়েছে তখন তাই ধরে নিতে হবে। অথচ লোকটা যে এমন সেটা আগে বুঝতে পারিনি। বদলি হিসেবে এসেছিল, আর কাজ করছিল ভালই। হঠাৎ যে কী গোলমাল হয়ে গেল।'

'সে লোক কি সত্যি করেই পালিয়েছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। এমন একটা কু-কীর্তি করে সেকি আর শহরে থাকবে? আমার সবচেয়ে আফসোস হচ্ছে যে আজ আপনাদের কাজটা হল না। ওটা বন্ধ করেছে আমার বাড়ির কর্মচারীরা। আমি জানলে বন্ধ হতে দিতাম না। আপনারা যদি চান তো কাল সকালেই আবার আসতে পারেন। আমার কোনও অসুবিধা হবে না।'

'তার কোনও প্রয়োজন হবে না', বললেন সুশীলবাবু, 'আপনি সেরে উঠুন। ইতিমধ্যে আমাদের অন্য জায়গায় অন্য কাজ আছে।'

শরবত খেয়েই আমরা সকলে উঠে পড়লাম। সার্কিট হাউসে যখন ফিরলাম তখন ছ'টা বাজে। আমি ঘরে গিয়ে স্নানের জোগাড় করব কিনা ভাবছি এমন সময় কেষ্টদা এল। তার মুখ গম্ভীর।

'কী হল, কেষ্টদা?'

'আমার কাজ কদ্দিন আছে তুমি বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করল কেষ্টদা।

আমি বললাম, 'চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'জগু ওস্তাদের কাজ কি চব্বিশের পরেও আছে?'

'না। ওর কাজ শেষ হচ্ছে চব্বিশে সকালে। ও সেইদিনই সন্ধ্যায় চলে যাবে।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'আমাদের কাজের চার্ট তো বসবার ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে। সেটা দেখলেই সব জানা যায়। কিন্তু তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ বলো তো।'

'কারণ ওর কাজ শেষ হবার আগে আমি এখান থেকে চলে গেলে মুশকিল হবে। যদ্দিন ওর কাজ চলছে তদ্দিন আমি কিছু বলতে পারব না। চব্বিশ তারিখ ও চলে যাবার আগে আমার যা করার করতে

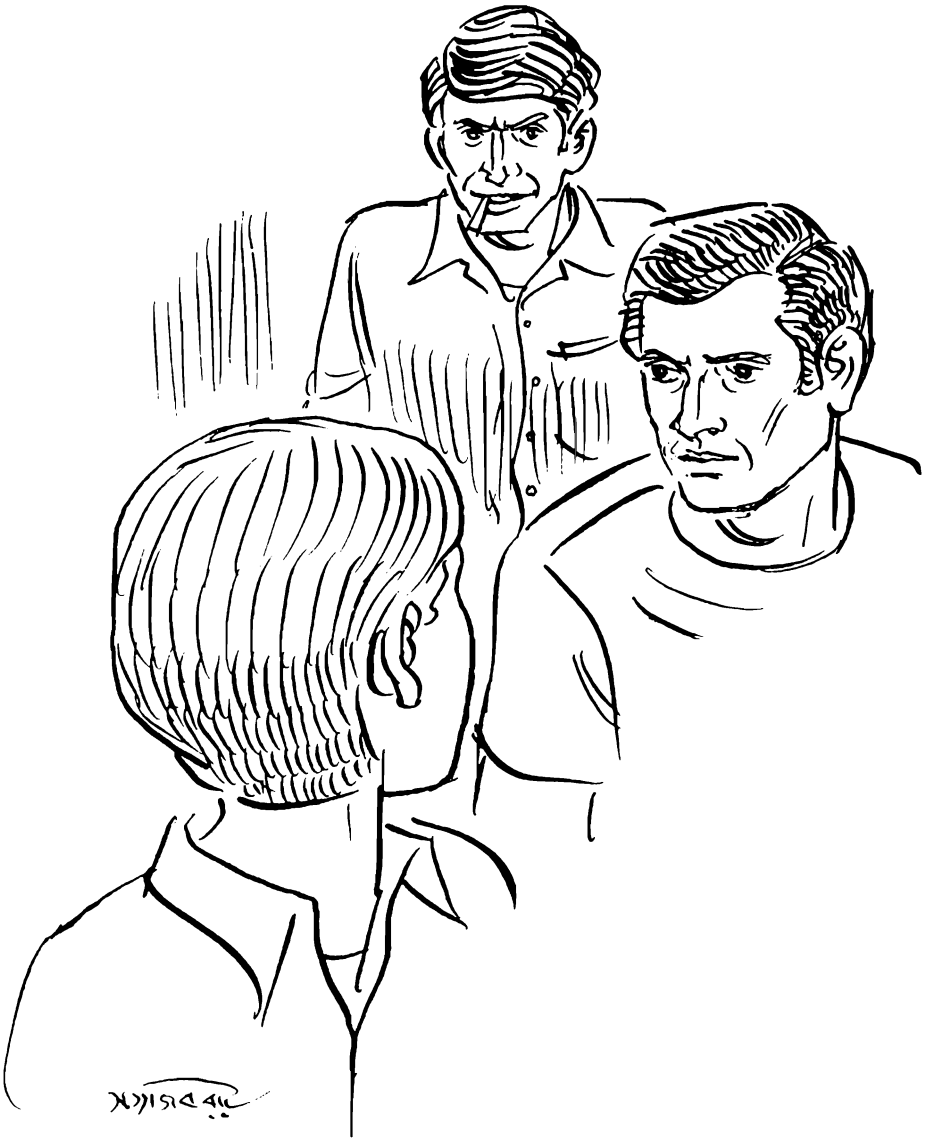

হবে। হাতে বোধহয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় থাকবে। খুব গোলমেলে ব্যাপার।'

আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কেষ্টদার ভাবনার কারণটা। ও আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'সবচেয়ে মুশকিল কোথায় জানো? আমি বললেই যে এরা আমার কথা বিশ্বাস করবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই।'

আমি কেষ্টদাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু পারলাম না। আরেকজন লোক এসে গেছে বারান্দায়। জগু ওস্তাদ।

'দুজনে খুব দোস্তি দেখছি।' বাঁকা হাসি হেসে বলল জগু ওস্তাদ। 'আরে ভাই, তোমরাই তো ক্ল্যাপ তুলবে হাউসে; আমাদের কপালে তো দুয়ো ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। তবে হ্যাঁ, এটা বলতে হবে যে

তোমাদের দুজনেরই কাজ হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস। মাস্টার অংশুর তো জবাবই নেই, আর স্টান্টম্যানও জবর।'

আমি বললাম, 'এসব আবার কী বলছ জগুদা, তুমি একটা ছবিতে থাকলে তোমার নামেই তো টিকিট বিক্রি হয় বলে শুনেছি।'

জগু ওস্তাদ হঠাৎ যেন দেমাকে ফুলে উঠল।

'তা ভিলেনের পার্ট করছি আজ এগারো বছর ধরে। অনেক এলেম লাগে ভিলেন করতে, বুঝলে কেষ্টভায়া—এটা তোমার ওই ডিগবাজি খাওয়া নয়। ভাল অ্যাকটিং আর জিমন্যাস্টিক এক জিনিস নয়।'

কেষ্টদা একটু হেসে নরম গলায় বলল, 'সে কি আমি অস্বীকার করছি ওস্তাদজি? আপনার নাম ছবির টাইটেলে বড় করে থাকবে। আমার তো নামই থাকবে না। আমাদের কাজ আর কুলিগিরিতে কোনও তফাতই নেই।'

কেষ্টদা যে এত বিনয়ী হতে পারে সেটা হয়তো জগু ওস্তাদ আশা করেনি, তাই সে একটু থতমত খেয়ে কথা পালটে বলল, 'আপসোস কী হচ্ছে জানো মাস্টার অংশু—এমন একটা পাথর লোপাট হয়ে গেল, আর আমি একবারটি দেখতেও পেলুম না। শুধু তোমাদের মুখে শুনে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হল। অবিশ্যি কে নিয়েছে পাথরটা সে তো জানাই আছে।'

'তার মানে?' আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

'ওই বিক্রম চাকরটা এক নম্বরের বজ্জাত।'

'তুমি কী করে জানলে?' জগু ওস্তাদের মতলবটা কী সেটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

'জানব না কেন?' বলল জগু ওস্তাদ, 'আমরা তো মদের দোকানে যাই নেশা করতে, তাই আমাদের সব রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। ও ব্যাটা একদিন এসেছিল দোকানে। আমাকে ভজাবার তাল করছিল। নেশা করে ব্যাটা বলে কি—আমার মনিবের একটা দামি পাথর আছে; তোমাকে এনে দিলে কত টাকা দেবে আমায়? ভেবেছে ফিল্ম অ্যাকটর তো, কোটিপতি না হলেও, লাখপতি তো হবে নির্ঘাত। আমি তখন সবে শুরু করেছি, মাথা একদম ক্লিয়ার। ব্যাটাকে দোকানের বাইরে নিয়ে এলুম, তারপর গলার মাদুলি ধরে টান দিয়ে মাথাটাকে মুখের কাছে এনে বললুম—'আর একটিবার অমন কথা বলেছ কি তোমাকে সোজা পুলিশের হাতে চালান দেব।'

'তাই করলেই তো পারতেন', বলল কেষ্টদা, 'তা হলে আর এই কেলেঙ্কারিটা হত না।'

'পাথর তো আর ওই ব্যাটার কাছে নেই', বলল জগু ওস্তাদ, 'ওটা অন্য জায়গায় পাচার করে মোটা বকশিশ নিয়ে ভেগেছে ব্যাটা বিক্রম। পুলিশের বুদ্ধি থাকলে এখানকার যত হিরে জহরতের কারবারি আছে তাদের বাড়ি রেড করা উচিত। জলের দরে অমন একটা পাথর পেলে এরা তো লুফে নেবে। যে পাথরের দাম হয়তো বিশ লাখ, তার জন্য হাজার দু' হাজার পেলেও ওই বিক্রম ব্যাটা বর্তে যাবে। একটা সামান্য চাকরের আর চাহিদা কত হতে পারে?'

জগু ওস্তাদ তার কথা শেষ করে গুড নাইট করে চলে গেল। আমি একটু অবাক হয়ে কেষ্টদার দিকে চাইলাম।

'কী মনে হচ্ছে কেষ্টদা?'

কেষ্টদা চুপ মেরে গেছে। দুবার এপাশ ওপাশ মাথা নাড়িয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এখন এক-একবার সত্যিই মনে হচ্ছে আমি ভুল শুনেছিলাম। অবিশ্যি সেটা হলেই ভাল হয়। যদি প্রমাণ হয় যে ওস্তাদ পাথরটা নিয়েছে বিক্রমের কাছ থেকে তা হলে ফিল্ম অ্যাকটরদের বদনাম হবে। সেটা মোটেই ভাল নয়।'

'না, তা নিশ্চয়ই নয়।'

॥ ১০ ॥

এই ঘটনার পরে অ্যাকটিং-এর সময় আমার বেশ কয়েকবার কথা গুলিয়ে গিয়ে 'এন. জি' হল। 'এন. জি.' মানে 'নো গুড'। তার মানে শটটা আবার নিতে হবে। শট যদি ঠিক থাকে তা হলে সেটা হয় 'ও. কে.'। একটা শট শেষ হওয়া মাত্র ডিরেক্টর বলে দেন সেটা ও. কে. না এন. জি.। সুশীলবাবু আমাকে

একবার জিজ্ঞেসও করলেন, 'অংশু, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?' কথাটা খুব নরম করে বললেও আমার ভীষণ লজ্জা লাগছিল। কারণ আর কিছুই না; নীলকান্তমণির ব্যাপারটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না বলেই যত গণ্ডগোল। বিশেষ করে জগু ওস্তাদের কথাগুলো বারবার মনে হচ্ছিল, আর মন বলছিল জগু ওস্তাদ নির্দোষ। ও যা বলেছে সেটাই আসলে ঠিক, কেষ্টদা নিশ্চয়ই উলটোপালটা শুনেছে।

দু'দিন লাগল মন থেকে নীলকান্তমণির চিন্তাটা তাড়িয়ে দিয়ে অ্যাকটিং করতে। তারপর অবিশ্যি আর এন. জি. হয়নি।

ইনস্পেক্টর মাহেশ্বরী কিন্তু তদন্তের ব্যাপারে বেশ নাজেহাল হচ্ছেন। সে-চাকর শহর ছেড়ে পালিয়েছে বটেই, কিন্তু সে যে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে সেটা পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও বার করতে পারছেন না।

তেইশ তারিখ সকালে আমার শুটিং ছিল মোহনের বাড়িতে। ইনস্পেক্টর সূর্যকান্ত গুণ্ডাদের হাত থেকে মোহনকে উদ্ধার করে তার বাবার কাছে এনে দিচ্ছে, বাবা ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরছে।

এই শুটিং মিঃ মাহেশ্বরী তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে দেখতে এলেন। বিশুদার প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন যে চোর এখনও ধরা পড়েনি। 'তবে বিক্রম যে লোক সুবিধের ছিল না তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বাজারে যাবার নাম করে মদের দোকানে গিয়ে মদ খেত। যেদিন চুরিটা হয় সেদিনও সে মদের দোকানে গিয়েছিল।'

পরদিন—চব্বিশ তারিখ—ভীষণ জরুরি দিন। আজকে মোটরবাইকে চড়ে কেষ্টদা আমাকে নিয়ে নালা টপকাবে। এই দৃশ্য তোলার জন্য দুটো বাড়তি ক্যামেরা লোকসমেত বম্বে থেকে এসেছে। সার্কিট হাউসে ঘর খালি করা হয়েছে, তাই তারা সেখানেই এসে উঠেছে, বাইকে নালা পেরনোর ব্যাপারটা একবারের বেশি করা রিস্কি বলে দৃশ্যটা তিনটে ক্যামেরা দিয়ে তিন জায়গা থেকে একই সঙ্গে তোলা হবে। একটা চড়াই দিয়ে এগোনোর সময়, একটা নালা টপকে পেরোনোর সময়, আর একটা উলটোদিকে উৎরাইয়ের মুখে ল্যান্ড করার সময়।

অবিশ্যি এই সিনের আগে সকালে অন্য কাজ আছে। তাতে তিন গুণ্ডা আর পুলিশের দল লাগবে। পুলিশ ছগনলালের দলকে গ্রেপ্তার করার দৃশ্য। ইনস্পেক্টর মাহেশ্বরী স্থানীয় পুলিশের লোক দিয়েছেন, তারাই শুটিং-এ পুলিশের কাজ করবে। আমার মনে আর এখন কোনও সন্দেহ নেই যে কেষ্টদা ভুল শুনেছিল। জগু ওস্তাদ আসলে নির্দোষ। তাকে ভজাতে চেষ্টা করেছিল বিক্রম, কিন্তু সে রাজি হয়নি। ভাগ্যিস! মিছামিছি জগু ওস্তাদের উপর দোষ চাপালে একটা বিশ্রী ব্যাপার হত!

একটা গোলমেলে ব্যাপার এই যে, আজ সকাল থেকে মেঘলা করেছে। অবিশ্যি হাওয়া আছে বলে মেঘ মাঝে মাঝে সরে গিয়ে রোদ বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিকেলে নালা টপকানোর শট্-এর জন্য রোদেরই দরকার, কারণ মোটরবাইক সংক্রান্ত আর সব শটে রোদ রয়েছে। আমি বুঝি গেছি যে এখানেও সেই কনটিনিউইটির ব্যাপার। একই দৃশ্যে দশটা রোদে তোলা শট-এর সঙ্গে একটা মেঘলায় তোলা শট জুড়লে ভীষণ চোখে লাগে। তাই সকাল থেকেই মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি যেন বিকেলে মেঘ সরে গিয়ে রোদ বেরোয়।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে একটা গাড়িতে আমি, কেষ্টদা, আর মেক-আপের দুজন লোক, আর অন্য গাড়িতে নতুন দুটো ক্যামেরা, তাদের ক্যামেরাম্যান আর সহকারী নালার শুটিং-এর জন্য বেরিয়ে পড়লাম। অন্যেরা সকাল-সকাল বেরিয়ে গেছে গুণ্ডাদের দৃশ্য তুলতে। তারা সেখান থেকে সোজা চলে যাবে নালার জায়গায়।

পথে হঠাৎ দেখলাম আমাদের তিন নম্বর গাড়িতে জগু ওস্তাদ আর আরও দু তিন জন লোক শুটিং সেরে সার্কিট হাউসে ফিরছে। তার মানে ছগনলালের কাজ শেষ।

সেদিনেরই মতো কুড়ি মিনিট লাগল নালার জায়গাটায় পৌঁছতে। মোটরবাইক আগেই এসে গেছে বাসের মাথায়। কেষ্টদা আর দেরি না করে বাইকে চড়ে পড়ল। যারা আগে এসেছে তারা সবাই এখন পুরি-তরকারি লাঞ্চ করছে। কেষ্টদা বলল, 'আমি একবার নালাটা টপকে পেরিয়ে দেখে নিচ্ছি। স্পিডের আন্দাজটা ঠিক করে নিতে হবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে দরকার হবে?'

কেষ্টদা মাথা নাড়ল—'তুমি চড়বে একেবারে শট-এর সময়।'

পথের ডান পাশে কিছু দূরে একটা তেঁতুল গাছ, তারই নীচে দলের সকলে খেতে বসেছে। কেষ্টদা চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল যে, সে একটা রিহার্সাল করে নিচ্ছে। আজই ওর শেষ কাজ, সেটা হলেই ও বম্বে ফিরে যাবে, হয়তো আর কোনওদিনও দেখা হবে না। এটা মনে হলেই আমার খুব খারাপ লাগছিল।

কেষ্টদা বাইকটাকে দাঁড় করিয়েছে নালা ঘেঁষে বেশ কিছুটা দূরে রাস্তার উপর।

'নালার দিকে কেউ নেই তো?' হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কেষ্টদা।

বিশুদা পরিবেশন করছিল, চেঁচিয়ে বলল, 'না, সবাই এখানে।'

আমি রিহার্সালটা দেখব বলে দৌড়ে নালার ধারে চলে গেলাম। তারপর গলা ছেড়ে হাঁক দিলাম, 'এসো, কেষ্টদা!'

আবার সেই কানফাটা শব্দ, সেই আচমকা ঝোপের পিছন থেকে বেরোনো, সেই দম-বন্ধ-করা লাফ, আর সেই ম্যাজিকের মতো—

কিন্তু এ কী? ওপারে গিয়ে বাইকটা একী হল? সেটা যে মুখ থুবড়ে পড়েছে উতরাইটা পেরিয়েই, আর কেষ্টদা যে বাইক থেকে ছিটকে গিয়ে পড়েছে ঝোপের মধ্যে।

'বিশুদা!'

চিৎকার ছেড়ে জুতো মোজা পরেই নালা পেরিয়ে উলটো দিকে গিয়ে উঠলাম।

মোটরবাইকটা একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে, তার একটা চাকা এখনও বনবন করে ঘুরছে, আর কেষ্টদা রাস্তা থেকে উঠে গা থেকে ধুলো ঝাড়ছে।

'আমি স্টান্টম্যান বলেই আজ বেঁচে গেলাম, অংশুবাবু! অন্য কেউ হলে...'

'ব্যথা পেয়েছ নিশ্চয়ই?'

আমার বুকের ভেতরে টিপটিপ করছিল।

'ঝোপটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। নইলে মাথায় চোট পেতাম নির্ঘাত।'

'কিন্তু কী করে—?'

'ব্যাপারটা আর কিছুই না; রাস্তাটাকে খুঁড়ে গর্ত করে তারপর আলগা মাটি দিয়ে বুজিয়ে কিছু পাথর আর খোলামকুচি ওপরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। দেখেই বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। তাই বাইকটা এসে পড়তেই মাটির ভিতর ঢুকে গেছে।'

বিশুদার সঙ্গে প্রায় সকলেই আমার ডাকে ছুটে এসেছে। কাণ্ড দেখে সকলের চক্ষুস্থির।

'কিন্তু এরকম করল কে?' প্রশ্ন করলেন সুশীলবাবু, 'আপনার উপর কারুর আক্রোশ আছে নাকি যে আপনাকে এভাবে টাইট দেবে?'

কেষ্টদার ঘাড় আর গাল ছড়ে গিয়েছিল; আমাদের সঙ্গে ফার্স্ট এড বক্স ছিল, তার থেকে ওষুধ নিয়ে লাগিয়ে দেওয়া হল।

সুশীলবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কোনও ধারণা আছে এ-কাজ কে করে থাকতে পারে?'

কেষ্টদা বলল, 'তা আছে, তবে কেন সে ধারণা হয়েছে সেটা বললে অনেক কিছু বলতে হয়। আমি শুধু বলছি যে আপনাদের জগু ওস্তাদ বলে যে অভিনেতাটি আছেন, তাঁর কলকাতা যাওয়া আপনারা বন্ধ করুন।'

বিশুদা দেখলাম কথাটা ভালভাবে নিল না। বলল, 'আপনি শুধু ওরকম বললে তো চলবে না। কেন এমন একটা ব্যাপার করতে বলছেন সেটা আমাদের জানতে হবে। আপনি কারণটা বলুন। কথা নেই বার্তা নেই আমাদের দলের একজনের ঘাড়ে দোষ চাপালে তো চলবে না। আপনার কি তার সঙ্গে কোনওরকম ঠোকাঠুকি লেগেছিল?'

কেষ্টদাকে অগত্যা সব কথাই বলতে হল। আমি এখন জানি যে, কেষ্টদার কথাই ঠিক, কিন্তু বিশুদা তার কথায় আমলই দিল না।

'দেখুন, কাপ্তেন মশাই', বলল বিশুদা, 'জগু ওস্তাদ যে সন্ধেবেলা নেশা করে সেটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তার নামে চুরির অপবাদ কেউ কোনওদিন দেয়নি। অনেকদিন হল সে ফিল্মের লাইনে কাজ করছে, আর কাজটা সে ভালভাবেই করে এটা কেউ অস্বীকার করবে না। আপনি বোম্বাই থেকে এসে বাংলার একজন অভিনেতা সম্পর্কে এমন একটা গুরুতর অভিযোগ করবেন সেটা তো আমরা বরদাস্ত করতে পারব না। আপনি মদের দোকানে তার মুখ থেকে কী কথা শুনেছেন সেটা তো আমি মানতে রাজি নই। আপনি নিজে যে নেশা করেন না তার কী প্রমাণ?'

কেষ্টদা বলল, 'আমি এককালে মাঝে মাঝে নেশা করতুম সেটা অস্বীকার করব না, কিন্তু একবার একটা স্টান্টে গড়বড় হয়ে যাবার পর থেকে গত পাঁচ বছরে আমি মদ ছুঁইনি। আমি যা শুনেছি তা ঠিকই শুনেছি, তাতে কোনও ভুল নেই। আজকের ঘটনাটাই প্রমাণ করছে যে আমি ভুল শুনিনি। সেটা আপনারা বিশ্বাস করেন কি না-করেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। আজকের এই অ্যাক্সিডেন্টের পর আমি একবারে শিওর যে জগু ওস্তাদের কাছেই রয়েছে ওই পাথর, আর আমি তার কথা শুনে ফেলেছিলাম বলেই সে রাস্তা খুঁড়ে রেখে আমাকে খতম করার চেষ্টা করেছিল।'

সুশীলবাবুকে ভীষণ চিন্তিত বলে মনে হচ্ছিল; এবার উনিই কথা বললেন—

'যাই হোক, এখন আসল কথা হচ্ছে যে, এই রাস্তা দিয়ে আর বাইক চালানো যাবে কি না। শটটা তো আমাদের নিতে হবে। আর এখানেই নিতে হবে, কারণ আমরা জানি যে এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা এইভাবে এই নালার উপর এসে পড়েনি।'

'শট নিতে কোনও বাধা নেই', বলল কেষ্টদা, 'ওই গর্তটাকে শক্ত মাটি আর পাথর দিয়ে ভাল করে বুজিয়ে দিলেই শট নেওয়া যাবে। ওটা প্রায় ফাঁপা ছিল বলে বাইক ওর মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল।'

আধঘণ্টার মধ্যে সবাই মিলে কাজ করে গর্তটাকে আবার বুজিয়ে দেওয়া হল। ঘড়িতে বলছে আড়াইটা। তা হলে এখন কি শট নেওয়া যায়?

না, যায় না, কারণ আকাশ মেঘে ভরে গেছে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। এমন কী বৃষ্টি নামলেও কিছু আশ্চর্য হবার নেই।

আমি জানি যে রোদ না উঠলে শট নেওয়া যাবে না। আমি কেষ্টদাকে একা পেয়ে তার পাশে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'জগু ওস্তাদ কিন্তু পৌনে ছ'টায় সার্কিট হাউস থেকে বেরোবে। সাড়ে ছটায় ওর ট্রেন।'

কেষ্টদা আমার কথার কোনও উত্তর দিল না। আমি ওর পিঠে হাত রাখলাম ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। বিশুদা ওর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলে সত্যিই অন্যায় করেছে।

এবার কেষ্টদা কথা বলল, তার গলা ভারী আর গম্ভীর।

'আমাকে কিছু বলতে এসো না। আমি বুঝেছি মানুষের উপকার করতে যাওয়া হচ্ছে বোকামো। বম্বে হলে লোকে আমার কথা মানত।'

আমার ভয় হল যে কেষ্টদা হয়তো রেগে গিয়ে আর শটটাই দেবে না। আমি তাই বাধ্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেষ্টদা, তুমি বাকি কাজটা করবে তো?'

'দেখা যাক', বলে কেষ্টদা চুপ করে গেল।

বৃষ্টি এল না, কিন্তু মেঘ জমে রইল। হাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে, তাই মেঘ আর সরতেই চায় না। আমার চোখ বারবার আকাশের দিকে চলে যাচ্ছে। শুধু আমি কেন, দলের সকলেই ওই একটা শট-এর অপেক্ষায় খালি খালি উপর দিকে চাইছে। সূর্যটা যে কোথায় আছে সেটা অবিশ্যি বোঝা যায়; এমনকী এক-একসময় মেঘ পাতলা হয়ে চারিদিকের আলো বেড়ে ওঠে, কিন্তু রোদ ওঠার নাম নেই। ক্যামেরাম্যানরা তাদের কাজের জন্য একটা কালো কাচ ব্যবহার করে, সেটা একটা ফিতে দিয়ে গলায় ঝোলানো থাকে। ধীরেশ বোস বারবার সেই কাচের ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে দেখছেন।

সাড়ে চারটে।

হঠাৎ দেখি কেষ্টদা বাইকটা নিয়ে হাতে করে ধরেই সেটা নালার ওপারে করে নিল, কারণ শটে ওদিক থেকেই আসবে বাইকটা। আমি মনে খানিকটা ভরসা পেলাম। মনে হচ্ছে কেষ্টদার রাগ কিছুটা পড়েছে। রাগ করবার যে যথেষ্ট কারণ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই জানি যে শয়তানির গোড়ায় রয়েছেন জগু ওস্তাদ। নীলকান্তমণি চুরি করে বিক্রম জগু ওস্তাদকেই দিয়েছে। কেষ্টদা যে ফন্দিটা ধরে ফেলেছে সেটা জগু ওস্তাদ কোনওরকমে জেনে ফেলেছে, আর তাই বদলা নেবার জন্য গতকাল লোকজন নিয়ে এসে রাস্তাটা খুঁড়ে আলগা মাটি দিয়ে ভরিয়ে রেখে গেছে। অথচ বিশুদা কেষ্টদার কথাটা বিশ্বাস করল না। শুধু বিশুদা কেন, কেউই করল না। স্টান্টম্যান বলে কি তার কথাও বিশ্বাস করতে নেই?

ইতিমধ্যে আমি অমৃতের পোশাক পরে নিয়েছি, আর দেখে নিশ্চিন্ত হলাম যে কেষ্টদাও গোঁফ লাগিয়েই ইনস্পেক্টরের পোশাক পরে নিল। কেষ্টদা রেডি হবার সঙ্গে সঙ্গেই দলের চার-পাঁচজন একসঙ্গে বলে উঠল—'রোদ বেরিয়েছে!'

আকাশের দিকে চেয়ে দেখি, সত্যিই মেঘ কেটে গিয়ে সূর্যসমেত অনেকখানি নীল আকাশ বেরিয়ে গেছে। অন্তত পাঁচ মিনিট থাকবে নিশ্চয়ই।

'ক্যামেরাজ রেডি?'

এই হুঙ্কারটা ছাড়লেন স্বয়ং ডিরেক্টর সুশীল মিত্তির।

তিনটে ক্যামেরা তিন জায়গায়—রাস্তার দু'পাশে আর নালার ধারে—বসিয়ে রাখা হয়েছে অনেক আগে থেকেই। এবারে তিনজন ক্যামেরাম্যান রেডি হয়ে গেলেন।

'চলো মাস্টার অংশু!' গম্ভীরভাবে বলল কেষ্টদা।

আমি আর কেষ্টদা মোটরবাইকে উঠে পড়লাম।

'ক্যামেরা স্টার্ট দিলে চেঁচিয়ে বোলো', হাঁক দিলেন সুশীলবাবু, 'তারপর বাইক স্টার্ট হবে।'

এবারে কেষ্টদা বাইকটাকে আরও বেশ অনেকখানি দূরে নিয়ে গেল। আগেরবার কিন্তু এতদূর থেকে রওনা হয়নি। এবার কি তা হলে আরও স্পিডে বাইক আসবে? আমার সেটা কেষ্টদাকে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন আর ওসবের সময় নেই।

'সবাই রেডি?' সুশীলবাবু চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিন ক্যামেরাম্যান আর কেষ্টদা বলে উঠল—'রেডি!'

আমি ক্যারিয়ারে বসে আমার হাত দুটো কেষ্টদার কোমরের দু'দিক দিয়ে পেঁচিয়ে দিয়েছি।

'আজ স্পিড বাড়াব', দাঁতে দাঁত চেপে নিজেই বলল কেষ্টদা, 'শক্ত করে ধরে থাকবে। কোনও ভয় নেই।'

'স্টার্ট ক্যামেরা!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিন ক্যামেরাম্যান একসঙ্গে বলে উঠল—'রানিং!'

আর চার-পাঁচ সেকেন্ড পরেই শোনা গেল।

'স্টার্ট বাইক!'

গোঁ করে গর্জন করে একটা ধাক্কা দিয়ে বাইক ছুটতে শুরু করল। আজ আর আমি চোখ বুজলাম না। আজ চেয়ে থাকব, সব দেখব। আগের দিনের দেড়া স্পিডে তীরবেগে চড়াই দিয়ে উঠে গেল বাইক।

এবারে সমস্ত পৃথিবীটা হঠাৎ যেন নীচে নেমে গেল।

বাইক শূন্যে উঠেছে। প্রচণ্ড হাওয়া।

শূন্য দিয়ে এগিয়ে আবার নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে।

পৃথিবী আবার উপরে উঠে এল।

এবার বুঝলাম স্পিড বাড়ানোর কারণ। গর্তটা ছাড়িয়ে শক্ত জমিতে নামবে কেষ্টদা। আমাকে পিছনে নিয়ে কোনও রিস্কের মধ্যে সে যাবে না।

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনির সঙ্গে বাইক আবার মাটিতে এসে নামল। আমি শুনলাম বহুদূর থেকে চিৎকার ভেসে এল—

'ও. কে.!'

আর তারপরে আরও দুটো 'ও. কে.!'

তার মানে তিনটে ক্যামেরাতেই শট ঠিকভাবে উঠেছে।

কিন্তু বাইক থামছে না কেন?

কেষ্টদা কোথায় চলেছে?

প্রশ্নটা মনের মধ্যে আসতেই আমি উত্তরটা পেয়ে গেলাম।

বিশুদা যাই বলুক, কেষ্টদা তার নিজের বিশ্বাসে কাজ করে চলেছে।

নালার জায়গাটা সার্কিট হাউস থেকে চোদ্দ কিলোমিটার। প্রচণ্ড স্পিডে দশ মিনিটে আজমীরে পৌঁছে একটা চৌমাথায় আসতেই একটা ট্র্যাফিক পুলিশের ঠিক পাশে এসে বাইকটা থামাল কেষ্টদা। তারপর পুলিশটিকে জিজ্ঞেস করল থানাটা কোথায়।

পুলিশ বুঝিয়ে দিতেই বাইক ছুটল আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে। কত স্পিডে যাচ্ছে বাইক? আশি? নব্বই? আমি জানি না। শুধু জানি এত স্পিডে আমি কোনওদিন কোনও গাড়ি চড়িনি। হাওয়ার শব্দে কান প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে, গায়ের লোম খাড়া।

এই যে পুলিশ স্টেশন।

তিন মিনিটের মধ্যে ইনস্পেক্টর মাহেশ্বরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমাকে দেখেই ভদ্রলোক চিনলেন। কেষ্টদার গায়ে ইনস্পেক্টরের পোশাক দেখে ভদ্রলোক হেসেই ফেললেন।

'কী চাই আপনাদের?'

'লোহিয়াজির পাথর,' বলল কেষ্টদা, 'আমি জানি কোথায় আছে। একটা জিপে চলে আসুন আমার সঙ্গে। যদি দেখেন ভুল বলছি তা হলে আমাকে হাজতে পুরবেন।'

হয়তো কেষ্টদার কথা বলার ভঙ্গির জন্যই মাহেশ্বরী রাজি হয়ে গেলেন।

'ঠিক হ্যায়, আমি আসছি আপনার সঙ্গে।'

'সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে নেবেন।'

'ও. কে.।'

বাইকে উঠেই কেষ্টদার কব্জিটা ধরে ঘুরিয়ে একবার ঘড়িটা দেখে নিলাম। ছ'টা বাজতে দশ। জগু ওস্তাদ স্টেশনে রওনা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।

বাইরে অন্ধকার। শহরের বাতি জ্বলে গেছে।

রাস্তার ট্র্যাফিককে আশ্চর্যভাবে বাঁচিয়ে কেষ্টদা বিদ্যুদ্বেগে ছুটে চলেছে স্টেশনের উদ্দেশে। পিছনে পুলিশের জিপ। বাইকের সঙ্গে তাল রেখে সেও চলেছে ছুটে। ঘন ঘন হর্ন দিয়ে লোক সরানো হচ্ছে রাস্তার মাঝখান থেকে।

স্টেশন এসে গেছে। কটা বাজল? থানা ছাড়বার পর পাঁচ মিনিটও হয়নি।

স্টেশনের বাইরে বাইক আর জিপ পর পর থামল।

'ওই যে জগু ওস্তাদ!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

ঠিক কথা। সেও সবেমাত্র স্টেশনে পৌঁছেছে। কুলির মাথায় মাল চাপাচ্ছে অটো-রিকশা থেকে নেমে।

'দ্যাট ইজ দ্য ম্যান!' জগু ওস্তাদের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে মাহেশ্বরীকে বলল কেষ্টদা।

মাহেশ্বরী জগু ওস্তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, তাঁর হাতে রিভলভার।

জগন্নাথ দে ওরফে জগু ওস্তাদ শেষ মুহূর্তে পালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। দু'দিক থেকে দুই পুলিশ এসে তাকে ধরে ফেলেছিল। তার কাছেই যে মিঃ লোহিয়ার নীলকান্তমণিটা পাওয়া গেল সেটা বোধ হয় আর না বললেও চলবে। পাথর ফেরত পেয়ে মিঃ লোহিয়া এত খুশি হলেন যে, কেষ্টদাকে দু' হাজার টাকা পুরস্কার দিয়ে ফেললেন। এটা যে হবে সেটা আমি জানতাম। কেষ্টদা স্টান্টম্যান ঠিকই, কিন্তু এটাও ঠিক যে এই পাথর উদ্ধার করার মতো স্টান্ট সে কোনওদিন করেনি।

সবচেয়ে আফসোস হয়েছিল বিশুদার। 'আপনাকে সেদিন ভুল করে কত কথা বলে ফেলেছিলাম; আশা করি আপনি অপরাধ নেবেন না।'

'অপরাধ আমি নিশ্চয়ই নেব না,' বলল কেষ্টদা, 'কারণ এ ছবিতে কাজ করে, বিশেষ করে মাস্টার অংশুর সঙ্গে কাজ করে, আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি।'

'আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে', বলল বিশুদা।

'কী, বলুন!'

'আপনাদের তো টাইটেলে কখনও নাম যায় না—আমি কথা দিচ্ছি এবার আমাদের ছবিতে আপনার নাম বড় করে আলাদা করে যাবে।'

'তা হলে আমার অনেকদিনের একটা সাধ পূর্ণ হবে,' বলল কেষ্টদা।

এসব কথা হচ্ছিল স্টেশনে। আমরা কাল সকালে সামান্য কয়েকটা কাজ সেরে সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা দেব; আজ কেষ্টদা বম্বে চলে যাচ্ছে, আমরা তাকে বিদায় দিতে এসেছি। কেষ্টদা এবার আমার দিকে ফিরল। তারপর তার ডান হাতটা বাড়িয়ে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'আমি তো দশ বছর হল স্টান্ট করছি, কাজটা আমার কাছে নাওয়া-খাওয়ার মতোই সহজ হয়ে গেছে; কিন্তু তুমি বারো বছর বয়সে তোমার প্রথম ছবিতেই যে সাহস দেখালে, সে স্টান্টের কোনও জবাব নেই।'

'কিন্তু আবার কবে দেখা হবে কেষ্টদা?'

'যেদিন এই ছবি রিলিজ করবে সেইদিন। মিঃ লোহিয়ার দেওয়া টাকা দিয়ে আমি নিজে টিকিট কেটে চলে আসব। নইলে বাংলা ছবি তো আর এমনিতে বোম্বাই পৌঁছবে না।'

ট্রেনে হুইসল দিয়ে দিয়েছিল। একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে কেষ্টদা পাদানিতে উঠে পড়ল।

'আসি, মাস্টার অংশু। ঠিকানাটা রেখে দিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

'চিঠি লিখো।'

ট্রেন ছেড়ে দিল।

'নিশ্চয়ই লিখব কেষ্টদা। নিশ্চয়ই লিখব।'

যতক্ষণ দেখা গেল কেষ্টদাকে ততক্ষণ সে পাদানিতে দাঁড়িয়ে এক হাত দিয়ে রড ধরে ঝুলে বাইরে বেরিয়ে অন্য হাত নাড়িয়ে আমাকে বিদায় জানাল।

দেশ শারদীয়, ১৩৯২